চন্দ্রাহত

চন্দ্রাহত

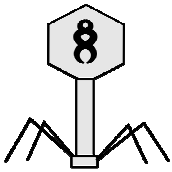

মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

ADEE

প্রকাশক
নাফিসা বেগম
আদী প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ২য় তলা, ঢাকা- ১১০০
ফোন: ০১৬২৬২৮২৮২৭
প্রকাশকাল: বইমেলা ২০১৮
© মারজিয়া সুলতানা
প্রচ্ছদ: আদনান আহমেদ রিজন
অনলাইন পরিবেশক: www.rokomari.com/adee
মূল্য : ৩৩০ টাকা

Chondrahoto by Md. Fuad Al Fidah
Published by Adee Prokashon
Islami Tower , Dhaka-1100
Printed by : Adee Printers
Price : 330 Tk. U.S. : 7 $ only
ISBN : 978 984 92440 8 0

উৎসর্গ

শরীফ মোহাম্মাদ–

আমার পাঠাভ্যাস বদলে দেয়ার জন্য এ ব্যক্তিই দায়ী

তৌফির হাসান উর রাকিব–

লেখালেখিকে নেশা বানাবার দোষটা আপনার ঘাড়েই পড়বে

সাজিদ রহমান–

কিছু কথা থাক না গোপন

ভূমিকা

মৌলিক হিসাবে তৃতীয় বই লেখা শেষ হলো। আলহামদুলিলল্লাহ্।

উপন্যাস নাকি এমন এক সাহিত্য কর্ম, যেটাকে নিয়ে লেখকের মনে খুঁতখুঁতানি রয়েই যায়। সম্ভবত বিশ্বের সব লেখকেরই হয় এমনটা। বারবার মনে হয়-কিছু একটা নেই। কিছু একটা যোগ করলে আরও ভালো হতো!

তিন নাম্বার বই হলেও, লেখক হিসেবে নিজেকে বড় নবীন মনে হয়। যা-ই লিখি না কেন, পরে পড়লে মনে হয় ছাইপাঁশ। সেই ছাইপাঁশের মধ্যে সবচেয়ে ভালো অংশটুকু নিয়ে এই বই। ছাইপাঁশই আছে না কিছু উন্নতি হয়েছে, তা বিচারের ভার পাঠকের।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অংশ অনেক বড় হওয়া উচিৎ। কিন্তু করব না, আমি আপনাদের বা তোমাদের কাছে ঋণী হয়েই থাকতে চাই।

বইটির বর্ণিত কাহিনি আমার কল্পনাপ্রসূত। পুরোটাকে একটা পরাবাস্তব জগত হিসেবে ধরে নিলেই ভালো হবে। বিশেষ করে পৌরাণিক অংশগুলো কখনও ঘটেনি, সেগুলোর এক বিন্দুও সত্যি নয়, আর কিছু ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য।

ডা. মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
ঢাকা, ২০১৮

আদী প্রকাশন থেকে প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বইঃ

অনুবাদ

স্যান্ড স্টর্ম

রামেসিসঃ দ্য সান অফ লাইট

আর্টেমিস ফাউল

সাইকো-২

আমেরিকান গডস

মৌলিক

রাত এগারটা

নীল নক্সা

In my years fighting crime, I've learned one truth - that every villain is the hero of his own story.

-Batman, Injustice 2

পুরাণ থেকে নেয়া

পুরাণকে কি ইতিহাস বলা যায়?

হয়তো পুরোপুরি যায় না। কেননা এমন অনেক পৌরাণিক কাহিনিই আমাদের সামনে এসে পড়ে, যা আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হিসেবে মেনে নিতে বড় কষ্ট হয়। যেখানে মাত্র কিছুদিন আগে আবিষ্কার হলো হেলিকপ্টার, সেখানে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে রাবণের পুষ্পক রথ অবিশ্বাসের জন্ম দেয় বৈকি! যেখানে আজও আমরা বিষাক্ত অনেক সাপের বিষ কাটাবার মতো ওষুধ খুঁজে পাইনি, সেখানে বেহুলা-লখিন্দরের গল্প কার না মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে?

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ বাদ দিয়ে যদি দেখা যায়, তাহলে সম্ভবত এক অস্বাভাবিক ব্যাপারের সম্মুখীন হতে হবে আমাদেরকে। কেন যেন একই রকম ঘটনা, একই নাটকের কুশীলব, নানা নামে আর নানা আকৃতিতে বিভিন্ন দেশের পুরাণে ঘোরাফেরা করছে!

গ্রিক পুরাণের একটা বহুল প্রচলিত গল্পের কথা ধরা যাক। পার্সিয়াস আর অ্যান্ড্রোমিডার গল্প। ইথিওপিয়ার রাণী ক্যাসিওপিয়ার মেয়ে ছিলেন অ্যান্ড্রোমিডা। মেয়ের রূপের গর্বে মাটিতে পা পড়ত না রাণী ক্যাসিওপিয়ার। এমন গর্ব করতেন যে একদিন বলেই ফেললেন, 'আমার মেয়ে জলপরীদের চাইতেও সুন্দর।'

বিনা দ্বন্দ্বে জলপরীরা এই কথা মেনে নিলে তো! সাথে সাথে গিয়ে তারা বিচার দেন দেবতা পোসাইডনকে। নিজের আশ্রিতাদের অপমানের কথা শুনে পোসাইডনও ক্ষেপে বোম। পাঠিয়ে দেন বিরাট এক সাপকে, যে সাপের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পরে ইথিওপিয়া।

অ্যান্ড্রোমিডার বাবা, রাজা সিফিয়াস চিন্তিত হয়ে পড়লেন। জিউসের কাছে এর প্রতিকার চেয়ে ফিরলেন আরও কালো মুখ নিয়ে। দেবরাজ জানিয়ে দিয়েছেন, এর প্রতিকার মাত্র একটা–অ্যান্ড্রোমিডাকে বিসর্জন দেয়া। নির্দিষ্ট দিনে তা-ই করতে হলো রাজা-রাণীকে। আদরের মেয়েকে সাপের খাবার হবার জন্য ফেলে রেখে আসা হলো সমুদ্রের ধারে। তারপর? তারপর অনেক গল্প। সংক্ষিপ্ত হলো এই যে, পার্সিয়ুস এসে হত্যা করেন সাপটিকে, উদ্ধার করেন অ্যান্ড্রোমিডাকে।

এবার জাপানের পুরাণের দিকে নজর দেয়া যাক। এই গল্প ওরোচি আর দেবতা সুসানোর। সুসানোকে কোন এক কারণে নির্বাসন দেয়া হয় স্বর্গ থেকে। অনেক পথ ঘুরে তিনি এসে পৌঁছান হাই নদী, যা কিনা তখন বিশাল বড় এক নদী ছিল, তার সামনে। দেখতে পান, দু'জন নারী-পুরুষ তাদের মাঝখানে এক মেয়েকে নিয়ে কান্না করছেন। কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তারা জানান, হিংস্র সাপ ওরোচির মুখের গ্রাস হয়েছে তার সাত মেয়ে। এই অষ্টম মেয়েকেও তার হাতেই তুলে দিতে হবে। সুসানো মুখোমুখি হলেন আট মাথা আর আট লেজ বিশিষ্ট ওরোচির। মুক্ত করে আনলেন মেয়েটিকে। নাম শুনবেন তার? ইনাডা।

পদ্ধতির মাঝে বেমিল থাকলেও, শুরু আর শেষের মাঝে অনেকটা মিল কি খুঁজে পাওয়া যায় না? হয়তো আসলেই ছিল এমন কোন সাপ, ছিল এমন কোন বীর আর এমন কোন নারী। কে বলতে পারে?

নানা দেশের পুরাণের মাঝে এমন মিল আরও অনেক খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন মিশরে রা আর অ্যাপোফিসের যুদ্ধের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় ব্যবিলনের মারদুক আর টিয়ামাতের যুদ্ধের, গ্রিক পুরাণে জিউসের সাথে টাইফুনের, ক্যানানাইটদের দেবতা বা'লের সাথে ইয়ামের, হিট্টিদের তারহান্টের সাথে ইলুয়ানকা অথবা ভারতীয় পুরাণে ইন্দ্রের সাথে ভিত্রের। মজার ব্যাপার হলো, পরবর্তীতে গ্রিকরা বা'ল আর জিউস একই অস্তিত্ব বলে শিকার করে নেন। আবার জিউস, ইন্দ্র, তারহান্ট আর বা'ল চারজনই ছিলেন হয় বায়ু, বজ্র আর ঝড়ের দেবতা! কাকতালীয়? হতেও পারে।

পুরাণ ঘাঁটলে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, আর তা হলো প্রতিটা পুরাণে সাপ বা সর্প-দেবতার প্রবল উপস্থিতি। অনেক ক্ষেত্রে এই সর্প-দেবতা বা দেবীকে দেখান হয়ে উপকারী হিসেবে (যেমন মায়ান কুলকুলাকান, অ্যাজটেক কেটজালকোয়াটাল বা ভারতীয় বাসুকি)। অনেক ক্ষেত্রে এরা ধ্বংসের প্রতিনিধিত্ব করেন–যেমন নর্ডিক জরমুনগান্ড, মিশরের অ্যাপোফিস, জাপানে ওরোচি। কিছু কিছু জায়গায় আবার তারা আছেন ভিন্ন এক রূপে, যারা ভক্তদের জন্য সব কিছু করতে রাজি আছেন। আবার যাদের উপর ক্ষিপ্ত হোন, তাদের সর্বনাশেও যাদের অরুচি নেই।

এমন দু'জন দেবীর নাম এখন উল্লেখ করব, যাদের প্রার্থনা-স্থলের মাঝে হাজার হাজার মাইলের পার্থক্য থাকলেও, বর্ণনা আর কার্যপ্রণালীর মাঝে রয়েছে বিশাল মিল। একজন মিশরের সর্প-দেবী ওয়াজেত বা ওয়াজেঠথ, আর অন্যজন আমাদের উপমহাদেশেরই মনসা।

ওয়াজেঠথ আর মনসা দেবীর মাঝে সবচাইতে বড় মিল হলো, তারা দু'জনেই সর্প-দেবী। দু'জনেই এক হিসেবে অনার্য, অর্থাৎ প্রথম থেকেই দেবী হিসেবে সম্মান পেয়ে আসেননি। ওয়াজেঠথ ছিলেন পের-ওয়াজেঠথ এর স্থানীয় দেবী। তার মূর্তিগুলোতে তাকে দেখান হতো কোবরার আদলে। কখনও কখনও দুই মাথাধারী সাপ, আবার কখনও সর্পিল দেহ অথচ মানবী চেহারায়। মাথায় থাকে ইউরেয়াস বা সর্প-তাজ, যা পরবর্তীতে মিশরের ফারাওদের মাথাতেও শোভা পায়। নিজের ভক্তদের জন্য একেবারে অন্তঃপ্রাণ এই দেবী। আবার যারা তাকে অমান্য করে, তাদের কপালে জোটে দেবীর তীব্র প্রতিশোধ। প্রতি বছর জুন মাসের শেষের দিকে আর মার্চের মাঝামাঝিতে এই দেবীর পুজো করার চল ছিল মিশরে।

আশ্চর্য হলেও সত্য, সবচেয়ে বিখ্যাত মনসা পূজার মুহূর্ত নাগ পঞ্চমী তিথিতে। হিন্দু পঞ্জিকার সালে মিলিয়ে দেখা যায়, এই সময়টা পরে জুলাই-আগস্ট মাসের দিকে!

দেবী ওয়াজেঠথের মতো, দেবী মনসাও কিন্তু লৌকিক দেবী। সাধারণত তার পূজা করা হয় সীজ বৃক্ষের শাখায়, ঘটে বা সর্প-অংকিত ঝাঁপিতে। তবে মূর্তি পূজার অনেক উদাহরণও প্রচলিত আছে। অসম রাজ্য এবং বাংলাদেশের নিচু বর্ণের হিন্দুদের মাঝে এখনও তার পূজা দেখা যায়। মূর্তিতে তাকে দেখা যায় এক চোখ কানা রমণী হিসেবে। যার মাথার তাজ হয়েছে সাপের ফণা।

দেবী মনসার জন্ম কীভাবে হয়েছে, তা নিয়েছে অনেক মতবাদ। তবে জন্ম যেভাবেই হোক না কেন, প্রথম থেকেই তাকে দেবত্ব দেয়া হয়নি। বড় হবার পর জানতে পারেন, একমাত্র মানুষের মাঝে পূজা শুরু হলেই তিনি দেবত্ব অর্জন করবেন। চাঁদ সওদাগরকে মনে ধরে তার, ঠিক করেন এর হাতেই পূজা নিবেন। অথচ চাঁদ সওদাগর শিবের ভক্ত ছিল বলে সে পূজা দিতে অস্বীকার করে। এর ফল হিসেবে সওদাগরের একে একে ছয় পুত্রকে ডুবিয়ে বা সাপে কাটিয়ে মেরে ফেলেন মনসা। সর্বশেষ সন্তান লখিন্দরও তার শিকারে পরিণত হয়। কিন্তু লখিন্দরের স্ত্রী বেহুলার তপস্যায় তুষ্ট হওয়া শিবের আদেশে, আর অবশেষে চাঁদ সওদাগর তাকে পূজা করতে নিমরাজি হওয়ায় তিনি লখিন্দরসহ সওদাগরের সব পুত্রের জীবন ফিরিয়ে দেন। এ নিয়ে পরবর্তীতে লেখা হয়েছে বিখ্যাত মনসা মঙ্গলকাব্য যা ইলিয়াড বা অডিসির চাইতে কোন অংশেই কম উপভোগ্য নয়।

যাই হোক, মনসা দেবীর মাঝেও দেখা যায় ওয়াজেঠথ এর মতো ভক্তদের প্রতি অনুরাগ আর অভক্তদের প্রতি তীব্র ঘৃণা। মনসা দেবীও প্রথমে উঁচু তবকার দেব-দেবীদের মাঝে আসন পাননি। আস্তে আস্তে সেটা তাকে অর্জন করে নিতে হয়।

ওহ, আরেকটা কথা, মনসা ছিলেন সাপ, বসন্ত থেকে আরোগ্য, প্রজননের দেবী। আর ওয়াজেঠথ? তিনি ছিলেন সাপ, রাজাদের সুরক্ষাদাতা, প্রজনন ও রোগ থেকে আরোগ্যের দেবী!

কে বলতে পারে, হয়তো প্রাচীন কালের ওয়াজেঠথ দেবীই ভারতে এসে রূপধারণ করেছেন মনসার। অথবা মনসা মিশরে গিয়ে রূপ ধারণ করেছেন ওয়াজেঠথের।

যদি টাইফুনের ভয়ে লেজ গুটিয়ে মিশরে পালিয়ে যেতে পারেন গ্রিক দেবতারা, চেহারা লুকিয়ে ডাইনোসিয়াস হয়ে যেতে পারেন ওসাইরিস বা অ্যাপোলো হয়ে যেতে পারেন হোরাস, তাহলে...?

কে বলতে পারে?

হয়তো...

৪
পুরোভাষ

কেউ কি বিশ্বাস করবে যে শিকদারের দুই হাঁটু বাড়ি খাচ্ছে?

তাও আবার ভয়ে!

যাকেই জিজ্ঞাসা করা হোক না কেন, উত্তরটা নিঃসন্দেহে না-ই হবে। অথচ অবিশ্বাস্য ঘটনাটা এখন...এই মুহূর্তেই ঘটছে! সারা দেশ যে অপরাধীর নাম শুনলে কাঁপে; পুলিশের সদস্যরা যার নাম শুনলে কিছুই শুনিনি-এমনভাব করে এড়িয়ে চলে, সেই শিকদারের পা এখন ঠক ঠক করে কাঁপছে! বেচারার বয়স যদি খুব কম বা খুব বেশি হতো, তাহলে হয়তো...

আবছা আলোয় রহস্যময় দেখাচ্ছে ঘরটাকে। বছর পাঁচেক আগের কথা, বাংলাদেশের আন্ডারওয়ার্ল্ডের ত্রাস, ডন ওয়াসা আনু পুলিশের হাতে মারা যাবার পর, অপরাধ জগতে সৃষ্টি হয় শূন্যতার। সেই শূন্যতা পূরণের জন্য উদগ্রীব ছিল অনেকেই। অন্যান্য দেশ যেমন বার্মা, ভারত আর দুবাইয়ের মাফিয়া বসদের নজরও পড়ে এই দেশে। কিন্তু না, তারা কেউ সফল হতে পারেনি। সবাইকে হারিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে অপরাধ-জগতের প্রভু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় একটা দল-অহিংশ। গুণ্ডা দলের দারুণ নামই বটে! সেই দলের প্রধান এনফোর্সার এই শিকদার। যদিও সেই সম্পর্কটা খুব কম মানুষই জানে। সবার ধারণা, শিকদার নিজের যোগ্যতাতেই আসীন হয়েছে ডনের আসনে।

গলির গুণ্ডা ছিল লোকটা, তবে নিজ দলের সবাই ছিল 'শিকদার ভাই' বলতে পাগল। হঠাত একদিন ছিনতাইয়ের দায়ে গ্রেফতার হয় সে। সেই সাথে অভিযোগ ছিল-ঘটনার শিকার পালাবার চেষ্টা করলে তাকে ছুরিকাঘাতও করেছে সে। অথচ এই কাজটা ওর ছিল না! সাজানো কেস যে সত্যি কেসের চাইতে বেশি শক্ত হয়–সেটা প্রমাণ করতেই যেন ছয় বছরের সাজা হয়ে গেল শিকদারের। দলের ছোট ভাইদের মাঝে অনেকেই চেয়েছিল, নিজের ঘাড়ে দায় তুলে নিতে–শিকদারকে এতটাই ভালোবাসত সবাই। কিন্তু শিকদার তা করতে দেয়নি।

জেলেই একদিন এক উকিল এসে দেখা করে ওর সাথে। সাদা-কালো ডোরাকাটা পোশাকটা ততদিনে গায়ে কুটকুটানির জন্ম দিয়েছে। গালে কয়েক সপ্তাহের না কামানো দাড়ি, দুশ্চিন্তায় চোখ বসে গিয়েছে কোটরে, গায়ের বোঁটকা গন্ধে পাশে থাকা দায়। সেদিন অদ্ভুত এক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল জেলখানায়। দেখা করার

কক্ষে অবস্থিত টেবিলের এক পাশে বসে ছিল নোংরা শিকদার, আর অন্য পাশে কেতাদুরস্ত পোশাক পরা উকিল।

প্রস্তাবটা দিতে খুব বেশি সময় নেয়নি কৌঁসুলি। শিকদার চেয়ারে বসতে না বসতেই বলে দিয়েছিল। ওর বিরুদ্ধে করা রায়ের ব্যাপারে উচ্চতর আদালতে আপিল করা হবে। যেভাবেই হোক, খালাস করে নিয়ে আসা হবে ওকে।

'বিনিময়ে আমাকে কী করতে হবে?' প্রস্তাবটা যে ওর মনে নতুন করে আশার আলো জাগিয়ে তুলেছে, তা কণ্ঠে প্রকাশ না করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাল শিকদার।

'এখন যা করছেন, তাই। আইনের বিপক্ষে অবস্থান করা। তবে-'

'তবে কী?'

'এখন আপনি সব কিছু করেন নিজের বুদ্ধিতে। যদি রাজি হন, তাহলে আপনাকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে আমাদের সব আদেশ।'

'আমাদের বলতে?' জানতে চেয়েছিল শিকদার।

'রাজি হলে আপনাকে সবই জানানো হবে, আর যদি রাজি না হবার ভুল সিদ্ধান্তটা নেন...' শ্রাগ করেছিল উকিল।

'ধরুন আমি আপাতত রাজি হলাম; কিন্তু পরবর্তী প্রতিজ্ঞা রাখলাম না, তাহলে?'

উত্তরে কেবল মুচকি হেসেছিলেন উকিল। সেই হাসিই উত্তর হিসেবে ছিল যথেষ্ট। আর কিছু দরকার হয়নি শিকদারের। বুঝে গিয়েছিল, প্রতিজ্ঞা না রাখাটা ওর ইচ্ছার উপর। কিন্তু যদি না রাখে, তাহলে জীবনের উপর আর তার কোন অধিকার থাকবে না।

পরবর্তী কয়েকটা সপ্তাহ যেন চোখের পলকে কেটে গেল। কোত্থেকে নতুন নতুন সাক্ষী এসে উদয় হলো! শিকদারের পক্ষে একের পর এক সাক্ষ্য দিয়ে গেল ওরা। নতুন প্রমাণে জানা গেল, ও সেদিন ঢাকাতেই ছিল না। অবশ্য এই দাবীটা প্রথমবারেও করেছিল ওর উকিল, প্রমাণ করতে পারেনি। এবার পারল। বেকসুর খালাস হলো শিকদার।

জেল থেকে বেরিয়েই দেখতে পেয়েছিল সেই কেতাদুরস্ত উকিলকে, আনমনে সিগারেট খাচ্ছিল লোকটা। ভাবখানা এমন যেন শিকদারকে দেখতে পায়নি। নিজে থেকেই এগিয়ে গিয়েছিল ও।

'এটা রাখুন।' একটা মোবাইল ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল ওর হাতে। 'আমার বস এটার সাহায্যে আপনাকে সব নির্দেশ দেবেন। খুব দরকার না হলে এই নাম্বারে ফোন করবেন না অথবা দেখা করার চেষ্টা করবেন না। আর এই হলো আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার। বিশ কোটি টাকা দেয়া আছে। সামনে আরও দেয়া হবে। ওহ

হ্যাঁ, জরুরী কিছু হলে স্যার নিজেই আপনাকে দেখা করতে বলবেন। কোথায়, সেটা তিনিই জানিয়ে দেবেন।'

এ কথাগুলো বলেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গিয়েছিল লোকটা।

কয়েক মাসের মাঝেই দেখা গেল, শিকদার ঢাকার অপরাধ জগতের প্রায় প্রতিটা স্তরে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। নেতা হিসেবে শিকদারকে যথেষ্ট ক্যারিশম্যাটিক বলা চলে। তাই দলের কর্মীরাও অন্তঃপ্রাণ।

ক্ষুরধার মস্তিষ্ক থেকে বের হওয়া বুদ্ধি, অগণিত টাকা আর নিবেদিত কর্মী- আন্ডারওয়ার্ল্ড কেন, চাইলে দেশও দখল করে নিতে পারত শিকদার।

তবে সেই মস্তিষ্কের মালিকের সাথে দেখে হয়েছে হাতে গোণা চারবার কী পাঁচবার। কোনবারই চেহারা দেখার সুযোগ হয়নি ওর। কণ্ঠও যে বিকৃত করা হয়েছে, তা-ও বুঝতে পেরেছে। এই তো, চোখের সামনেই আছে রহস্যময় সেই আদেশ দাতা। এমনিতেই ঘর আলোছায়ায় ভরা, তারপর একটা পর্দার আড়ালে বসে কথা বলছে সে। অনেকটা ক্যাথলিক চার্চের কনফেশন বুথের মতো। দুই পক্ষই একে অন্যের কথা পরিষ্কার বুঝতে পারে, শুনতে পারে। কিন্তু চেহারা অদেখাই রয়ে যায়।

'টেবিলের উপর একটা হলুদ খাম আছে।' গমগমে কণ্ঠটা বলে উঠল, তবে একটু যান্ত্রিক। যেন কোন যন্ত্র ব্যবহার করে কথা বলা হচ্ছে। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আছে অবয়বটা, চেয়ারে বসা। পাশ থেকে দেখতে পাচ্ছে বলে লোকটার সম্পর্কে কিছুই আঁচ করতে পারছে না শিকদার। না তার উচ্চতা আর না তার দেহের গড়ন।

এগিয়ে এসে খামটা হাতে নিল শিকদার। উপুড় করতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা ছবি আর কিছু কাগজ। আটাশ-উনত্রিশ বছরের একটা মেয়ের ছবি ওটা। ছোট করে কাটা কালো চুল, রোদ চশমা চোখে। বাংলাদেশে সাধারণত আটাশ বছর বয়সী মেয়েরা দুই-তিন বাচ্চার মা হয়ে যায়। দেহের বাঁধুনি বলতে কিছু থাকে না। তবে এই মেয়ে বেশ...যৌবনবতী!

'মেয়েটা যেন দুই-তিন দিনের মাঝে মারা যায়, সে ব্যবস্থা করো।'

চমকাল না শিকদার, আগের যে কয়বার দেখা হয়েছে, সে কয়বারও কাছাকাছি ধরনের নির্দেশ পেয়েছে।

ভীত হতে পারে ও, কিন্তু বোকা না। প্রতিবার খুন করার পর নজর রেখেছে পত্রিকার পর্দায়। চেয়েছে যদি কিছুটা হলেও আন্দাজ করা যায় রহস্যময় এই দল আর ততোধিক রহস্যময় এই মনিবের ব্যাপারে। যদি খুনের শিকার হওয়া সবার মাঝে কোন যোগসূত্র পাওয়া যেত, তাহলে লোকটার ব্যাপারে কিছু সন্দেহ করা

যেত হয়তো। কিন্তু না, কোন মিল বা কোন যোগসূত্র পায়নি অনেক খুঁজেও। তাই রহস্যটা হয়ে গিয়েছে আরও গভীর।

কোন লক্ষ্য নিয়ে অপরাধ করতে নামা মানুষকে বোঝা সহজ। লক্ষ্য চ্যুতি হয়, এমন কোন কাজ তারা করে না। সমস্যা হয় এসব আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ্যহীন মানুষের কাজ করতে। এরা হয় মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়, আর নয়তো হয় প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী।

ক্ষমতাশালী লোকের চাকর হয়ে থাকা সম্ভব, কিন্তু সেই নাগপাশ থেকে বেরোন সম্ভব না। আর বেরোতে না পারলে, শিকদারের একচ্ছত্র অধিপতি হবার স্বপ্ন অধরায় রয়ে যাবে।

মুখে এসব কিছুই বলল না ও। 'আমি আমার সেরা ছেলেটাকে–'

'নাহ!' গর্জে উঠল যেন কণ্ঠটা। 'তুমি নিজ হাতে কাজটা করবে!'

চমকে উঠল শিকদার। এমন আদেশ আগে আসেনি। 'কিন্তু আমি যে নিজে অপারেশনে যাওয়া বাদ দিছি!' আমতা আমতা করে বলল।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রহস্যময় কণ্ঠ। এই নীরবতাটুকু যেন হাজারো ঢোলের চাইতেও বেশি জোরে এসে লাগল শিকদারের কানে। যখন মনে হচ্ছিল, আর সহ্য করতে পারবে না নীরবতা, তখন কথা বলে উঠল কণ্ঠটা। 'আমরা কি তাহলে ভুল লোককে বেছে নিয়েছিলাম?'

চুপ হয়ে গেল শিকদার।

'পারবে, নাকি অন্য কাউকে দেখব?' কণ্ঠটা যেন ওর মৃত্যুদণ্ড শোনাচ্ছে।

'না, স...স্যার।' ঢোক গিলে গলা পরিষ্কার করে নিল শিকদার। 'আমি পারব।'

'গুড,' বলে বাতি নিভিয়ে দিল কণ্ঠের মালিক। ইঙ্গিত পরিষ্কার, বেরিয়ে যাও।

মানে মানে কেটে পড়ল শিকদার।

তবে মনে মনে ভাবল, প্রথম সুযোগে...একদম প্রথম সুযোগে পেঁদিয়ে তোদের ভূত ছাড়াব!

পর্ব এক

উন্মেষ

এক

২৫ জানুয়ারি, ২০১৬
রাত এগারোটা

আকাশে চাঁদ নেই, নিকষ কালো রাজপথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে এক যুবক। বয়স টেনে-টুনে পঁচিশ হবে, পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা দেহটা পেটানো। মাথায় ঘন কালো চুল, মুখে একটা স্টার সিগারেট।

চেহারা বা দেহ সৌষ্ঠবের সাথে কমদামী সিগারেটটা যায় না; তবে পরনের ইউনিফর্মটা দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় তার কারণ। চারপাশ অন্ধকার হলেও, সিগারেটের আলোতে নীলচে পোশাকটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। বুক পকেটের লোগো থেকে বোঝা যায়, দেশ সেরা এক বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার কর্মচারী ও।

ঢাকা শহরে সাধারণত রাত এগারোটাকে রাত হিসাবে গণ্য করা হয় না। মানুষ জনের পদচারণায় চারপাশ মুখরিত না থাকলেও, গাড়ি-ঘোড়া চলে। খোলা থাকে মুদীর দোকান আর টঙের দোকানও। রাতের ঢাকা যেন আরও সুন্দর, জনসংখ্যার ভারে পিষ্ট নগরী তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ছিনতাইকারীরা এই সময়টায় বের হবো হবো করে, গণিকাদের খদ্দের খোঁজা পুরোদমে শুরু হয় আরও একটু পরে। নেশাখোরদের অধীনে শহর চলে যাবার আরও ঘন্টা দুয়েক দেরি আছে।

তিন শিফটে কাজ করতে হয় যুবক, ওরফে সানিদের। সকাল, দুপুর, রাত-এই তিন শিফটের মাঝে দুপুরেরটাই বেশি বিরক্তিকর লাগে ওর কাছে। ওমর সানির সাথে নাম মেলে বলে নিজেকে তার মতোই মনে করে যুবক। চুলও রেখেছিল স্বপ্নের নায়কের মতো, বড় বড়...কাঁধ পর্যন্ত। চেহারার প্রতি আলাদা যত্নটাও সে কারণেই। দুপুরে ঘুমালে দেহের বাঁধন ঠিক থাকে, রাতে না ঘুমালে কালি জমে চোখের নীচে। তাই সানির চেষ্টা থাকে সবসময় সকালের শিফট নেবার। দুপুরের শিফট শেষ হতে হতে রাত দশটা। দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে এগারোটা-বারোটা। এদিকে বের হতে হয় সেই দুটোয়। খেয়ে-দেয়ে একটু গড়িয়ে নেবারও উপায় নেই। বিরক্ত বদনে তাই সিগারেট টেনে চলছে বেচারা।

সিগারেট স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলেও, মেয়ে পটাবার জন্য অসাধারণ। আলাদা একটা স্টাইল আর আভিজাত্য এনে দেয় ঠোঁটের এক কোণ দিয়ে পুড়তে থাকা বিষ। অন্তত সানির সেটাই ধারণা।

মৌসুমীর কথা মনে পড়তেই মেজাজ খিঁচরে গেল ওর। গত কয়েকদিন ধরে মেয়েটার স্বামী বাড়িতে। চোরের বৌ নাকি সবার বৌ, অন্তত মৌসুমীর ক্ষেত্রে তেমনটাই হতে যাচ্ছিল। মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে থাকে সানি। ভাড়া বাড়ি, দোতলাটা মেস বানিয়ে নিয়েছে বাড়ি মালিক। নিচ তলায় থাকে নিজেই। পাশের বাড়ির নিচতলায় থাকে বিহারী মেয়েটা। আসলে নামে বিহারী, জন্ম আর বেড়ে ওঠা বাংলাদেশেই। স্বাধীনতার পর জন্মগ্রহণকারীদের বারবার নাগরিকত্ব দেবার প্রস্তাব দেয়া সত্ত্বেও, কোন এক অদ্ভুত কারণে বিহারীরা তা নেয়নি। নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত হওয়ায় এখানকার অধিবাসীরা অল্প বয়সেই জড়িয়ে পড়ে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। এলাকার সব পাণ্ডাদের কাছে তাই এখানকার যুবক সমাজ যেন এক সোনার খনি। মৌসুমীর স্বামী হারুনও তেমনই এক কম বয়সে ভুল পথে পা বাড়ানো যুবক।

এখন প্রায়শই পুলিশ আসে ওর খোঁজে। প্রথম প্রথম কিছুদিন ছিনতাই, মাদক ব্যবসা ইত্যাদি করলেও, এখন হারুনের অপরাধ নেমে এসেছে ছিঁচকে চুরিতে। বিয়ে করছে একদম অল্প বয়সে, মেয়েও এখানকারই। একদিন ছিনতাই করতে গিয়ে মাতাল হারুন ছুরি ঠেকিয়ে বসে পুলিশেরই এক কনস্টেবলকে। আর যায় কোথায়। কথায় বলে, পুলিশ ছুঁলে আঠারো ঘা। কিন্তু পুলিশকে ছুঁলে যে ঘা দেবার জায়গাও অবশিষ্ট থাকে না, তা হাড়ে হাড়ে টের পেল হারুন। পাক্কা দশদিন হাজতে থাকার পর যখন বাইরে বেরুল, তখন বেচারার সামনের এক পা ভেঙ্গে গিয়েছে। সময়মতো চিকিৎসা না পাওয়ায় এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয় বেচারাকে।

শিক্ষা-দীক্ষা নেই; এতদিন যে গর্ব ছিল শরীর নিয়ে, সেটাও এখন সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছে। কামানোর ফন্দি তাই এখন একটাই-চুরি। একবার পুলিশের খাতায় চোর হিসেবে নাম লেখালে আর রক্ষা নেই। আশেপাশের ছিঁচকে চুরি থেকে পুকুর চুরি পর্যন্ত যাই হোক না কেন, পুলিশ একবার হারুনের খোঁজে আসবেই। আর এলে চোরের সুন্দরী বউ মৌসুমী কে নিয়েও চলে হালকা টানাটানি।

এসব কিছুই জানে সানি। পাশের বাড়ির সুন্দরী গৃহবধূ ওর নজরেও পড়েছে। নামটাও করেছে আকর্ষণ। একদিন তাই মেয়েটার এই অবস্থা দেখে এগিয়ে আসে ও। সানি যেখানে চাকরী করে, সেখানে ওর ইউনিট প্রধান এক্স-র‍্যাব। সাধারণত ইন্টার পাস একজন সাধারণ প্রহরীর, সিকিউরিটি ফর ইউ বা এস.এফ.ওয়াই.-এর ইউনিট প্রধান পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু সুন্দর চেহারা আর চুলের প্রতি অস্বাভাবিক যত্নের প্রবণতাটা সারা ইউনিটের কাছেই সানিকে পরিচিত করে তুলেছে। আজমল স্যারও তার ব্যতিক্রম নয়।

যাই হোক, মৌসুমীকে বিব্রত হতে দেখে এগিয়ে আসে সানি। প্রথম প্রথম খুব চোট-পাট দেখাচ্ছিল পুলিশের কনস্টেবল। কিন্তু সে তো আর জানে না, সানি দোতালা থেকে নামার আগেই তার স্যারকে সব জানিয়ে এসেছে। তিনি আবার তার অধীনস্থদের প্রতি খুব অনুরক্ত। তাই পদক্ষেপ নেন সাথে সাথে। থানার ও.সি.র ধমক ওয়্যারলেসে ভেসে আসা মাত্র ভেজা বেড়াল বনে গেল বেচারা কনস্টেবল। মৌসুমীর সামনে তো বটেই, পুরো মহল্লায় নাম ছড়িয়ে গেল সানির।

ওর এই পরোপকার যে একেবারে নিঃস্বার্থ ছিল না, তা অন্য কেউ বুঝতে না পারলেও, মৌসুমী বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিল। আসলে মেয়েদের স্রষ্টা বানিয়েছেন বিশেষ এক ক্ষমতা দিয়ে। কোন পুরুষের দৃষ্টি অথবা স্পর্শ অথবা কর্মকাণ্ডের পেছনের কারণটা কী, তা তার খুব সহজেই ধরে ফেলে। মৌসুমী তায় আবার লেখাপড়া জানা, ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়া। সানির আচরণের অর্থ সে ধরতে পেরেছিল প্রথমেই। অন্য সবার মতোই, আরেকজন ভাবী-ভক্ষক হিসেবে সে ধরে নিয়েছিল যুবককে। তাই এড়িয়ে চলত প্রথম প্রথম।

ভুল হয়েছিল মেয়েটার। সানি সত্যিকার অর্থেই প্রেমে পড়েছিল মেয়েটির। আসলে যতটা না মেয়েটির দেহের বা চেহারার, তার চাইতে বেশি প্রেমে পড়েছিল মেয়েটির আচরণের। চোরের বউ অপবাদ মাথায় নিয়ে খুব কম মেয়েই তার শ্বশুড়-শাশুড়িকে নিজের বাবা-মা জ্ঞানে সেবার করতে পারে। মৌসুমী সেই বিরল প্রজাতির একজন।

এই ঘটনা বছর দেড়েক আগে, এরপর আর কোন পুলিশ বিরক্ত করেনি হারুনের পরিবারকে। হারুনের কথা অবশ্য ভিন্ন, প্রায়শই তাকে পালিয়ে পালিয়ে থাকতে হয়। মাসে-দু মাসে একবার বাসায় আসে। এক-দুই দিন থেকেই আবার উধাও হয়ে যায়। যা রেখে যায় তা দিয়ে হয়তো দিন পনেরো চলে, বাকিটা থাকতে হয় আধ পেটা খেয়ে।

হারুনের মা একদিন সখেদে এসব কথা বলছিল সানিকে। এদিকে সানির পরিবারে সদস্য বলতে কেবল মা। জায়গা-জমি খুব একটা নেই, তবে যা আছে তা দিয়ে আয়েসে চলে যায় ওর মার গ্রাম্য জীবন। বেতনের টাকা জমাচ্ছে সানি, ইচ্ছা একদিন গ্রামে ফিরে গিয়ে বড়-সড় এক মুদির দোকান দেবে।

যখন ছেলেটা জানতে পারল, দুই বুড়ো-বুড়ি এক সপ্তাহ ধরে প্রায় আধপেটা খেয়ে আছে, নিজেকে আর থামাতে পারল না। সাথে সাথে কয়েক কেজি চাল, ডাল আর গোটা চারেক মুরগী কিনে আনল। মৌসুমী তখন বাড়ির বাইরে, কোথাও ধার-টার বা কোন কাজ পাওয়া যায় কিনা তা খুঁজছে। সদাইগুলো রান্নাঘরে রেখে চলে গেল অফিসে, ডিউটি করতে।

ফিরে এসে মেসের সঙ্গীর কাছে শোনে, নীচে নাকি কুরুক্ষেত্র বেঁধে গিয়েছিল। গর্বিত মৌসুমি আধা-পেটা কেন, খালি পেটে থাকতেও রাজি আছে। কিন্তু সানির সাহায্য নিতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত অনেক তর্ক-বিতর্কের পর চুপ করে মেয়েটি। বৃদ্ধা শ্বশুড়-শাশুড়ির মুখ চেয়ে রান্নাও করে সে। কিন্তু এক লোকমা খাবার নাকি নিজের মুখে নেয়নি।

তখনই আরও বেশি করে প্রেমে পড়ে যায় সানি ওর। সিদ্ধান্ত নেয়, যে করেই হোক মেয়েটাকে তার চাই। নাহ, লোভ চরিতার্থ করার জন্য নয়, নয় দেহটাকে ভোগ করার জন্য। চাই স্ত্রী রূপে, ঘরণী আর অর্ধাঙ্গী রূপে।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সানি অপেক্ষায় থাকে হারুনের পরবর্তী আগমনের। লোকটা আসার ঠিক পনেরো দিন পর, এক ছুটির দিনে বসে যায় জানালার পাশে। মৌসুমী বাইরে বেরোন মাত্র ছুটে চলে যায় নিচে। আগেরবারের মতো এবারও কিছুক্ষণ হারুনের বুড়ি মার পাশে কাটিয়ে রওনা দিল দোকানের দিকে। বাজার সদাই করে দিয়ে চলে এল ঘরে।

বিকালের দিকে দরজায় কড়া নাড়ল কেউ। মেস ফাঁকা, কেউ নেই আর। সবাই চাকরিজীবী। আসতে আসতে সেই রাত আটটা-নয়টা। উঠে দিতে তাই দরজা খুলে দিল সানি। মৌসুমীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আঁতকে ওঠার ভান করল ও, অথচ মনে মনে মেয়েটার অপেক্ষাই করছিল।

'আসবার পারি?' দিনের পর দিন আধপেটা খেয়ে কাটিয়ে দেয়া মেয়ের কণ্ঠ যে এতটা সুললিত হতে পারে, জানা ছিল না সানির।

'অবশ্যই, আসেন।'

ভেতরে পা রাখল মেয়েটি, চারপাশে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'কেউ নাই?'

'না।'

'ভালো।' কিছুটা দৃঢ় কণ্ঠে বলল মৌসুমী।

মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিল সানি, বুঝতে পারছে মেয়েটা ঝগড়া করার জন্যই এসেছে। কিন্তু এরপর সে যা করল, তাতে হতবাক হয়ে গেল ও।

চৌকাঠের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটা, ঘুরে দাঁড়িয়ে লাগিয়ে দিল দরজা। এরপর সানির দিকে ফিরে একটানে খুলে ফেলল শাড়ি।

অষ্টাদশী নারীর অর্ধ-নগ্ন শরীরের সামনে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যুবক!

সম্বিত ফিরল মেয়েটার পরের কথায়, 'দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কী দেখ? এইডাই তো চাও, তাই না? লয়া লও।'

মাথার ভেতর হাজারটা কথা খেলে গেল সানি। যতই সাজুগুজু করুক আর হিরোগিরি দেখাক, নারী দেহের সাথে পরিচয় নেই ওর। এদিকে মেস পুরো ফাঁকা।

চাইলেই সামনে দাঁড়ানো এই নারীকে আপন করে নিতে পারে। চাইলেই সানি অবগাহন করতে পারে মৌসুমীতে।

কাঁপা কাঁপা হাতে মেঝেতে পড়ে থাকা শাড়ির আঁচল চুলে নিল ও, এরপর জড়িয়ে দিল মৌসুমীর দেহে। এরপর তারচেয়েও কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল, 'যা আমি করছি, তোমারে ভালোবাসি বইল্যাই করছি। ভোগ করার লাইগ্যা না।'

অবাক হয়ে সানির দিকে কিছু তাকিয়ে রইল মৌসুমী। নায়ক-নায়িকার নামধারী দুই যুবক-যুবতীর প্রেম হলো ছায়াছবির মতো ঘটনা দিয়েই। এই এক আচরণ দিয়েই নায়িকার মন জয় করে নিল নায়ক।

এরপর থেকে মৌসুমী নিজেও যেন হার মেনে নিল। সানি বাজার-সদাই করে দিলে আর আগের মতো চিৎকার চেঁচামেচি করে না। প্রায়শই নিচ থেকে রান্না করা খাবার আসতে শুরু করো সানির মেসে। মেসবাসীরা তো ঠুঁটো জগন্নাথ নয়, জল্পনা-কল্পনা আর কানাঘুষা শুরু হয়ে গেল পুরোদমে।

ঘটনা উঠে গেল হারুনের কানেও। পঙ্গু হারুন ক্ষেপে উঠল, বন্য প্রাণীর আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্ত্রীর উপর। সেরাতে পাশের বাড়ি থেকে ভেসে এল সপাং-সপাং বেতের আওয়াজ। আর সেই সাথে হারুনের চিৎকার, 'চিল্লাছিস না কেন, মাগী? তোর ভাতারকে শোনা। দেখে এসে তোকে বাঁচায় কিনা।'

সানির ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুটে চলে যায় নিচে। হারুনের মতো দুই চারটা পঙ্গুকে সে সকাল-বিকাল চিবিয়ে খেতে পারে। কিন্তু করল না, মৌসুমীর আত্মসম্মানবোধের কথা চিন্তা করেই করল না।

পরেরদিন সকাল সকাল বেরিয়ে গেল হারুন। সূর্য একটু গরম হবার পর মৌসুমী কাপড় শুকাতে বাইরে এলো। মেয়েটার কালশিটে পড়া চেহারা আর কালো হয়ে ফুলে ওঠা চোখ দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারল না সানি। এক ছুটে চলে এল প্রেমিকার কাছে। 'আর কতো সহ্য করবা? আমি তো তোমারে কইছি, ওই চোট্টার কথা ভুইল্যা যাও। আমার সাথে গ্রামে চলো। মাকে তোমার কথা সব বলছি, বলছি হারুন কতো অত্যাচার করে তার কথাও। মার কোন আপত্তি নেই।' একমাত্র পুত্রের বিয়ে এক তালাক-প্রাপ্ত মেয়ের সাথে হবে, একথা কল্পনাও করতে পারছিল না সানির মা। কিন্তু পুত্র বিষ খাওয়ার হুমকি দিলে আর অমত করেনি সে। একথা ভুলেও মৌসুমীকে জানাল না ও। 'কাইলক্যাই তালাকের জন্য আবেদন করো। তোমারে যেমনে মাইর দিছে, তাতে পাইতে সমস্যা হবে না।'

চুপ করে রইল মেয়েটা, জবাব দিল না কোন।

'কী হইল, কথা কও!' তাড়া দিল সানি।

'হারুনের লগে আমি থাকবার চাই না। কিন্তু আমি গেলে আব্বা-আম্মার কী হইব?' বেশ কিছুক্ষণ পর জবাব দিল মেয়েটা।

স্তম্ভিত হয়ে গেল সানি, কিন্তু আজ একটা না একটা হেস্ত-ন্যাস্ত করেই ছাড়বে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছে। 'দেখ, দিনের পর দিন তোমারে এমন কষ্ট করতে দেখবার পারুম না। আমারে একটা জবাব তোমার দিতেই হইব। তুমি গেলেগা চোট্টা আরেকটা বিয়া করব, ওই বুড়া-বুড়ির সমস্যা হইব না।'

চুপ করে রইল মৌসুমী, সে নিজেও একটা বিহিত চায়। কিন্তু এদিকে শ্বশুর-শাশুড়িকে ছেড়ে যেতেও মন চাইছে না। 'আমারে একমাস সময় দাও।'

'এক মাস!' আঁতকে উঠল যুবক। 'এতদিন দেয়া যাবে না। বড় জোর এক সপ্তাহ দিবার পারি।'

এই ঘটনার পর পার হয়ে গিয়েছে ছয়দিন। আজকেই সেই সপ্তম দিন। আজকেই মিলবে প্রশ্নের উত্তর।

অন্যান্য দিন অফিস থেকে বেরিয়েই লেগুনায় উঠে বসে। গিয়ে নাম বাড়ির কাছে, মেইনরোড থেকে ওর বাড়িটা মাত্র মিনিট দশেকের হাঁটা দূরত্ব। কিন্তু আজকের কথা ভিন্ন। ভয় আর আশার দোলাচলে পেন্ডুলামের মতো দুলছে ওর মন। একবার মনে হচ্ছে, মৌসুমীর চলে আসাটা প্রায় নিশ্চিত। আরেকবার মনে হচ্ছে, নিজের চাইতে দুই বুড়া-বুড়িকে নিয়ে যদি বেশি মাথা ঘামায়?

বিকাল থেকে একের পর এক সিগারেট টানছে সানি। এমনিতে ডিউটি আওয়ারে সিগারেট খাওয়াও নিষেধ। তবে দিনের বেলা একেক পোষ্টে দুই-তিন করে থাকে বলে, ঘন্টায় ঘন্টায় বাইরে গিয়ে খেয়ে এসেছে। মাথা পরিষ্কার করার জন্য আজ হেঁটেই বাড়ির পথ ধরেছে। তবে বিপদ কোন দিক থেকে আসছে, সেটা আন্দাজ করতে পারলে হয়তো বাড়িতেই ফিরত না।

যদি মেয়েটা রাজি হয়, তাহলে কালকে প্রথমেই যেতে হবে কোন উকিলের কাছে। নাকি নারী নির্যাতন নিয়ে কাজ করে–এমন কোন এন.জি.ও.র কাছে যাবে? এসব ভাবতে ভাবতে বেখেয়ালে চীন মৈত্রীর সামনের রাস্তা ধরল ও। ওদিকে সন্ধ্যায় পা রাখাটাই একটু ঝুঁকি পূর্ণ হয়ে যায়, রাতের বেলা তো প্রশ্নই আসে না। বিখ্যাত এই স্থাপনার ঠিক সামনের রাস্তাটায় আলোর ব্যবস্থা ভালো মতোই আছে। তবে সেখান থেকে একটু এগোলেই, অন্ধকার গিলে নেয় এলাকাটাকে।

ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছে সানি, পেছন থেকে আসা পদশব্দটা শুনতেও পেল না। অন্ধকার মতো একটা জায়গায় এসে শেষ হয়ে গেল সিগারেট। মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই উঠে পড়বে মিরপুর রোডে। আরেকটা ধরাবার জন্য প্যাকেট বের করল যুবক। দুই ঠোট দিয়ে শলাকা চেপে ধরে হাতে নিল লাইটার। বাতাস বইছে;

আগুনের শিখা যেন নিভে না যায়, সেজন্য এক হাত দিয়ে ঢাকল আগুন। সিগারেটের শলায় ছুঁইয়ে প্রাণ ভরে টানল একবার। আগুন বন্ধ করে উপরের দিকে মুখ তুলে ধোঁয়া ছাড়ল।

কিন্তু মুখ আর নামাবার সময় হলো না, তার আগেই চাঁদিতে শক্ত কিছুর আঘাত পেয়ে টলে উঠল নিজেকে নায়ক ভাবা সানি। জ্ঞান হারিয়ে আছড়ে পড়ল ব্যস্ত নগরীর আপাত শান্ত পিচ ঢালা রাস্তায়।

প্রথমে ফিরে এল দৃষ্টিশক্তি। আচ্ছন্নভাবটা রইল আরও কিছুক্ষণ। বারবার মাথা ঝাঁকাল সানি, নড়ার প্রয়াস পেল। কিন্তু কী আশ্চর্য! মাথা নাড়াতে পারলেও, দেহটাকে নড়াতে পারল না এক ইঞ্চিও।

চোখের ঠিক সামনে ছাদ থেকে ঝুলন্ত একটা বাতি জ্বলছে। ওটার হলুদ আলোয় চারপাশে তাকাল একবার। ছোট একটা ঘরে আছে ও, বসে আছে একটা চেয়ারে। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। দুই পা বেঁধে রাখা হয়েছে চেয়ারের দুই পায়ার সাথে। বুকের উপর টের পাচ্ছে দড়ির বাঁধন।

চোখ বাঁধা নেই, তাই একটু শান্ত হয়ে চারপাশে তাকাল ও। একটা মাত্র জানালা রয়েছে ঘরটায়। ওটা দিয়ে আলো আসছে না কোন। কতক্ষণ ধরে অজ্ঞান হয়ে আছে সানি, সেটা বুঝতে পারছে না। হতে পারে কয়েক ঘন্টা, আবার এক দিন পেরিয়ে আরেক রাত হয়ে যাওয়াটাও অসম্ভব না। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে না, তবে আটকানো পাল্লা একদম অল্প ফাঁক হয়ে আছে। বাইরের দৃশ্যও অন্ধকার, মানে রাত চলছে।

মুখ বাঁধেনি অপহরণকারীরা। আবার চোখও বাঁধেনি। এর অর্থ দুটোর একটা হতে পারে, হয় অপহরণকারী এতটাই ক্ষমতাশালী যে ওর কিছু দেখে ফেললেও যায় আসে না। আর নয়তো ওকে আর ফিরতে দেয়া হবে না।

কিন্তু কোনটাই আসলে ঠিক মিলছে না। এমন কারও সাথে ওর শত্রুতা নেই, যে ওকে একেবারে মেরে ফেলতে চাইবে। একটু আধটু সাইজ করা ভিন্ন কথা, সেটা তো চাইলে হারুনও করতে পারে। কিন্তু ছিঁচকে একটা চোর এত কিছু করার সাহস পাবে না।

আর রইলে ফিরতে না পারার কথা, সেক্ষেত্রে ও এখানে কেন? শেষ যে স্মৃতিটা মনে পড়ছে, তা তো চীন মৈত্রীর পাশের রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাবার স্মৃতি। ওকে খুন করতে চাইলে তো সেখানেই করতে পারত। কোন কোথাও টেনে আনার কী অর্থ!

'কেউ আছে?' কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে যখন কোন কূল-কিনারা পেল না, তখন চিৎকার করে উঠল ও। 'হ্যালো, শুনতেছেন?'

মিনিট পাঁচেক চিৎকার করেও যখন লাভ হলো না কোন, তখন হাল ছেঁড়ে দিল বেচারা। চুপচাপ বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিল। খুব উঁচুদরের না হলেও, কিছু প্রশিক্ষণ আছে ওর। সিদ্ধান্ত নিল, বসে থেকে দেখা যাক।

প্রায় আধ-ঘন্টা পর, হুট করে খুলে গেল সামনের দরজা। মাঝারী আকৃতির এক লোক এসে দাঁড়াল ওখানটায়। লোকটার চেহারা দেখার জন্য পিট পিট করে তাকাল। কিন্তু বাতির আলো সরাসরি চোখে এসে পড়ছে বলে পারল না। ভেতরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা, এসে দাঁড়াল বাতির ঠিক কাছেই। ঘাড় তুলে তাকাতে হচ্ছে এখন সানিকে। কিন্তু আলো আরও বেশি করে চোখে পড়ছে বলে দেখতে পাচ্ছে না কিছুই।

'কেডা আপনি? কী চান?' কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল সানি।

উত্তর দিল না কোন আগন্তুক। তবে ঝুঁকে এল একটু, লোকটার চেহারা এবার দেখতে পেল যুবক। চেহারাটা কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা।

সাথে সাথে বুঝতে পারল সানি, এখান থেকে আর জান নিয়ে ওকে ফিরতে হচ্ছে না।

গলা শুকিয়ে এল বেচারার, এতক্ষণ অনেক কষ্টে শান্ত রেখেছিল নিজেকে। এখন আর পাড়ল না, ভয়ে কেঁপে উঠল ওর বুক। 'কী চান আপনে? আমারে ধইর‍্যা আনছেন ক্যান? আমি কী করছি?'

উত্তর না দিয়ে ঘোঁত করে হেসে উঠল লোকটা।

'আ...আমি...' কিছু একটা বলার প্রয়াস পেল সানি। কিন্তু পরমুহূর্তে ডান চোয়ালের উপর বেমক্কা মারের আঘাত পেয়ে চুপ হয়ে গেল। নোনতা রক্তের স্বাদে ভরে উঠেছে মুখটা। আঘাতটা খালি হাতে মারা হয়নি, ইস্পাতের নাকল পরে মারা হয়েছে।

মাথাটা টলে উঠল বেচারার। কিন্তু সামলে নেবার সুযোগ পেল না, তার আগেই আরেকটা ঘুষি খেল, এবার বাঁ চোয়ালে। ব্যথার প্রচণ্ডতায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ও।

এবার যখন জ্ঞান ফিরল, তখন প্রথম অনুভূতিটা পেল ব্যথার। তীব্র ব্যথা ওকে যেন গিলে খেয়েছে। এতক্ষণ খোলা ছিল মুখটা, কিন্তু কে যেন রুমাল গুঁজে বন্ধ

করে দিয়েছে। অবশ্য না দিলেও ক্ষতি ছিল না। ভাঙ্গা চোয়াল নিয়ে বড়জোর গুঙিয়ে উঠতে পারত বেচারা, চিৎকার করতে পারত না।

পরবর্তী আধা ঘন্টায় আরও কয়েকবার জ্ঞান হারাল সানি। প্রতিবার জ্ঞান ফিরে পেল পানির ছোঁয়ায়, শান্তি মতো অজ্ঞানও হতে দিতে চায় না অপহরণকারী। বাছা বাছা মারে সারা শরীর ফুলে উঠেছে। একে একে ওর দুই হাত ভেঙে ফেলা হয়েছে, পাঁজরের কয়েকটা হাড়ও রেহাই পায়নি। ভেঙে ফেলা হয়েছে দুই পা-ও।

তীব্র আক্রোশ নিয়ে যেন অপহরণকারী আছড়ে পড়েছে বেচারার উপরে।

মনে মনে মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করছে এখন যুবক। মাথা থেকে মৌসুমীর চিন্তা কবে উধাও হয়ে গিয়েছে। এখান থেকে পালাবার স্বপ্নও দেখছে না ও। মনে-প্রাণে চাইছে, মৃত্যু এসে ওকে মুক্তি দিক।

প্রার্থনা মঞ্জুর হলো ছেলেটার।

কিন্তু চোখ দুটো উপড়ে ফেলার আগে নয়!

৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬
রাত এগারোটা পঞ্চান্ন

'ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...'

আদ্যিকালের মোবাইলে বেজে ওঠা অ্যালার্ম শুনে ঝটকা দিয়ে সোজা হয়ে বসল সুমন। ডিউটি শুরু হয় রাত দশটায়, শেষ সেই সকাল আটটায়। এরইমাঝে ঘুমিয়ে পড়েছে জানলে, আর চাকরি করতে হবে না।

অবশ্য বেচারার দোষ নেই খুব একটা। মাত্র সতেরো বছর বয়সী ছেলেটা এস.ফর.ইউ. কোম্পানিতে জয়েন করেছে মাত্র কয়েকদিন আগে। ট্রেনিং শেষ হবার আগেই কী এক বিশেষ কারণে ওকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে তুলনামূলক নিরাপদ একটা প্রতিষ্ঠানে। মহাখালীর কমিউনিকেবল ডিজিজ রিসার্চ সেন্টার বা সি.ডি.আর.সি.-র নিচতলায় কাজ করছে ও। রিসার্চার বা গবেষকরা যেখানে বসেন, সেই ঘরগুলো প্রহরায় ব্যস্ত।

প্রতিষ্ঠানটা আধা-সরকারি, বিদেশী সাহায্যও আসে প্রচুর। প্রায় চার হাজার কর্মচারী কাজ করে এখানে। সাততলা বিল্ডিংটার নিচতলাটা একটু আলাদা। চতুর্ভুজ আকৃতির এই বিল্ডিংটার একদম নিচতলায় দুটো অংশ। এক অংশ হাসপাতাল,

ওখানে কেবল সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীরা থাকে। দেড়শো বিছানার হাসপাতাল হলেও, রোগীর সংখ্যা কখনওই পাঁচশোর কম থাকে না।

অন্য অংশটায় বসেন গবেষকেরা। তাদের ঢোকার পথ, বেরোবার পথ-সব আলাদা। হাসপাতাল আর এই অংশটা তাই পাশাপাশি অবস্থান করলেও, বিশেষভাবে নির্মিত দরজা দিয়ে দুটোকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। কী-কার্ড ব্যবহার না করে দরজাগুলো খোলাই যাবে না। একমাত্র হাসপাতালের ডাক্তার আর সুমনদের, মানে গার্ডদের কাছে রয়েছে সব দরজা খোলা যায় এমন কী-কার্ড। গবেষকদের মাঝে যারা হাসপাতালের সাথে সম্পর্কযুক্ত নন, তারা হাসপাতালে ঢোকা যায়, এমন দরজাগুলো খুলতে পারেন না।

সুমন যেখানে বসে আছে, সেখান থেকে সদর দরজা দেখা যায় না। ওখানে ডিউটি দিচ্ছেন ইলিয়াস ভাই। ভাগ্য ভালো দেখা যায় না, নইলে ইলিয়াস ভাইয়ের মতো কড়া লোক নিশ্চিতভাবেই ওর চাকরী খেয়ে নিতেন। একটু এগিয়ে দৃষ্টি পথের প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল সে। অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, ইলিয়াস ভাই স্টেশনে নেই।

দুশ্চিন্তায় ভরে গেল ওর মন। এ কী? ভাই কী তাহলে ওকে ঘুমাতে দেখেছেন? বিচার দিতে গিয়েছেন শিফট ইন-চার্জের কাছে।

পরে ভাবা যাবে ওসব নিয়ে, এখন আপাতত সামনের ঝামেলা মেটানো যাক। এই ভেবে গবেষকদের দরজার কাছে এসে সোজা দাঁড়াল সুমন। রাত ঠিক বারোটা থেকে বারোটা পনেরো পর্যন্ত সবাইকে বিশেষভাবে সাবধান থাকতে বলা হয়েছে।

কেন, জানতে চেয়েছিল ও। উত্তরে জানানো হয়েছে, ইউনিট প্রধান নাকি রাত ঠিক বারোটায় একবার সার্ভারে লগ-ইন করে সি.সি. ক্যামেরার দিয়ে দেখেন। সাত তলায় প্রায় দুইশো ক্যামেরা, অবশ্য নিচতলাতেই তার অর্ধেক। একেক শিফটে পাহারা দেয় ষাট জন প্রহরী। সবার অবস্থা দেখে লগ-আউট করেন চীফ।

সত্যিটা যে কতটা ভিন্ন, তা যদি জানত সুমন।

আচমকা সামনে থেকে এক আগন্তুককে আসতে দেখল ও। ওর পাহারা দেয়া দরজাটা বিল্ডিং-এর ঠিক মাঝখানে। ও যেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, একটু সামনে এগিয়ে বাঁ দিকে তাকালেই গবেষকদের ঢোকবার-বেরোবার স্থান নজরে পড়ে। দরজাটা যে দেয়ালের সাথে লাগানো, সেটার দুই পাশে দুই ঘর থাকায়, কেবল সামনের দিকটাই দেখতে পায় ও। যাই হোক, ডান দিকে একটা করিডর আর সোজা আরেকটা দরজা। ডান দিকের করিডরের মাথার দরজা আর সামনেরটা মিলেই এই ছোট অংশটাকে হাসপাতাল থেকে আলাদা করে রেখেছে।

আগন্তুক যেহেতু সামনের দিক থেকে আসছে, তাই হয় সে রোগীর লোক আর

নয়তো হাসপাতালের কর্মচারী-আন্দাজ করল সুমন। রোগীর লোক হলে তো দরজা খুলতে পারবে না, কিন্তু হাসপাতালের কর্মচারী হলে পারবে। আজকে ওর দ্বিতীয় দিন, তাই কর্মচারীদের সবাইকে চিনে ওঠার প্রশ্নই আসে না।

হাট করে যখন সামনের দরজাটা খুলে গেল, তখন ঘড়িতে বাজে রাত বারোটা দুই।

লোকটা ডান-বাঁয়ে না তাকিয়ে সরাসরি চলে এল সামনে, সুমনের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'উমা ম্যাডাম আছে না?'

'উমা ম্যাডাম?' থতমত খেয়ে গিয়েছে বেচারা প্রহরী, গবেষকদের কাউকেও চেনে না।

'চেনো না? নতুন এসেছে?' কিছুটা বিরক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল লোকটা।

'জ...জি।'

'ওহ, যাও তাহলে। দেখে এসো ম্যাডাম আছে কিনা।'

গ্রামের ছেলে সুমন, এরকম ভারিক্কি স্বরের আদেশ শুনতেই অভ্যস্ত। সেসব আদেশ নিয়ে প্রশ্ন করা ওর ধাতে নেই। আর তাছাড়া, হাসপাতালের কর্মচারীকে সন্দেহ করার কথা ওর কল্পনাতেও আসেনি। 'অবশ্যই, স্যার।' বলে এগিয়ে গেল নিজের দরজার দিকে।

আচমকা পেছন থেকে ওকে চেপে ধরল কেউ, ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে গেল বেচারা।

গলাটা যখন ছোরার ধারাল ফলায় ফাঁক হয়ে গেল, তখনও সেই বিহ্বলতা কাটেনি।

কাগজ-পত্র গোছাচ্ছে বিশিষ্ট মাইক্রোবায়োলজিষ্ট, সি.ডি.আর.সি.-র জুনিয়র সায়েন্টিস্ট উমা চক্রবর্তী। আগামীকাল রাতের ফ্লাইটে জেনেভা যেতে হবে ওকে। নতুন এক যুগান্তকারী আবিষ্কার তুলে ধরতে হবে বৈজ্ঞানিকদের সামনে। সেজন্যই রাত বারোটার বেশি বেজে যাওয়া সত্ত্বেও, এখনও অফিস থেকে বেরোয়নি ও। অবশ্য অফিস আওয়ার নয়টা-পাঁচটা হলেও, কাজ পাগল মেয়েটা কখনও রাত নয়টার আগে বের হয় না। মাঝে মাঝে দশটাও বেজে যায়।

মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে এমন একটা বিশাল সংস্থার জুনিয়র সায়েন্টিস্ট হওয়া চাট্টিখানি কোন কথা নয়। এরজন্য দরকার স্থিরতা আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, দুটোর

কোনটারই অভাব নেই উমার। বিয়ে করেনি, নেই কোন বন্ধু-বান্ধবও। বন্ধু না থাকার কারণটা বেশ অদ্ভুত। কেমন একটা নাকি বোটকা গন্ধ পাওয়া যায় ওর গা থেকে, অন্তত ঘনিষ্ঠ জনেরা তাই বলে। চেপে ধরে পাপার মুখ থেকেও কথাটা বের করিয়েছে ও। যখন পাপা স্বীকার করলেন, তখন আর সত্যিটা বলেনি সে।

বলেনি ও নিজেও অন্য সবার কাছ থেকে কেমন একটা যেন বোটকা গন্ধ পায়।

হাজার ডাক্তার দেখিয়েও কোন লাভ হয়নি, বারবার যকৃত আর হরমোন পরীক্ষা করে দেখেছ। সমস্যা নেই ওগুলোর কোথাও। মরণব্যধি ক্যান্সার থেকে সেরে ওঠার পর, এই পর্যন্ত আর কোন রোগে আক্রান্ত হয়নি উমা।

...শুধু এই একটা সমস্যা বাদে...

কাগজ গোছাতে গোছাতে সামনে থাকা সালাদের পাত্র থেকে এক চামচ লেটুস আর পালং শাক তুলে মুখে পুরল উমা। শাকাহারী ও, মাছ-মাংস একদম ছোঁয় না। প্রতিদিন তাই বাসা থেকে নিয়ে আসতে হয় খাবার।

টুং-টাং আওয়াজ হলো একটা বাইরে থেকে, নিশ্চয়ই ড্রাইভার অধৈর্য হয়ে ভেতরে এসেছে ওকে নেবার জন্য। পাপার নিয়োগ করা এই ড্রাইভার কাজ করছে মাত্র মাস দু'য়েক হলো। কিন্তু ভাবে মনে হয়, উমাই তার কর্মচারী।

'আসছি বাবা, আসছি।' মনে মনে বলল মেয়েটা। ঠিক করল, আজকে যদি ড্রাইভার উল্টা-পাল্টা কিছু বলে তো পাপাকে বলে কালকেই ছাড়িয়ে দেবে। বেয়াদবি একদম সহ্য করবে না। দরজায় নকের আওয়াজ শুনতে পেয়ে কাজের গতি আরও বাড়িয়ে দিল ও।

'খোলাই আছে।' চিৎকার করল ও। 'তবে আসতে হবে না। আমার কাজ শেষ, বাইরে দাঁড়াও। আসছি।'

কিন্তু আধ মিনিট পর যখন দরজা খুলে গেল, তখন বিরক্ত হয়ে চোখ তুলে চাইল ও। 'বললাম তো আসছি,' মুখ তুলতে তুলতে বলল উমা। 'শুনতে পাও না...'

মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল উমার। সামনে দাঁড়ানো লোকটা ওর ড্রাইভার নয়। কালো রুমালে মুখ ঢেকে কেউ একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে উদ্যত অস্ত্র।

ধুপ–ধুপ।

নিকষ কালো গহ্বররূপি পিস্তলটা দু'বার অনল বর্ষাল।

কপালে টিপ নিয়ে যখন মেঝেতে আছড়ে পড়ল বিশিষ্ট বিজ্ঞানী উমা চক্রবর্তী, তখন ঘড়িতে বারোটা বেজে আট।

দুই

সকালের নরম, মিষ্টি রোদ এসে ভিড় জমিয়েছে ব্যালকনিতে।

বারান্দা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রাফসান বিন সেলিম। অফিসের দেরি আছে। নয়টায় শুরু, তবে বিজ্ঞানী বলে মাঝে মাঝে একটু দেরি করে গেলেও ক্ষতি হয় না। সেটা অবশ্য প্রায় প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে অফিস থেকে বের হয় বলে পুষিয়ে যায়। আজ কেন যেন ঘর থেকে বেরোতে ইচ্ছা করছে না।

আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল ছয় ফুটের কাছাকাছি লম্বা যুবক। অবশ্য যুবক বলা চলে ওকে বিদেশী স্ট্যান্ডার্ডে। বাংলাদেশী সমাজে ত্রিশোর্ধ্ব পুরুষকে মাঝবয়সী ধরে নেয়া হয়। কারণও আছে। লোকে বলে, খাবারের নাকি অভাব বিশ্বে। কিন্তু উপমহাদেশের ত্রিশোর্ধ্ব পুরুষ বা নারীদের দেখলে তা বোঝার উপায় নেই। বিশেষ করে যারা মধ্যবিত্ত পরিবারের, তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য।

খাবারের কারণে না যতটা, কায়িক পরিশ্রম না হবার কারণে তার চাইতে বেশি মোটা হয় লোকে। খাওয়ার সময় হুঁশ থাকে না যে এই ক্যালরিটুকু ব্যায়াম করে বের না করে দিলে, মেদ হয়ে অবস্থান নেবে কোমরে আর বুকে। দামী, মুখরোচক খাবার খেয়ে খেয়ে সবাই তাই শুধু ফোলে আর ফোলে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, অথচ এখনও স্বাস্থ্য সচেতন, তেমন লোক আর যেখানেই হোক না কেন, বাংলাদেশী মধ্যবিত্ত সমাজে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তবে রাফসানের ব্যাপারটা আলাদা। প্রায় পাঁচ বছর বিদেশে কাটিয়ে আসায়, এখনও স্বাস্থ্য ধরে রেখেছে ও। পুলিসের চাকরি বাদ দিয়ে আমেরিকায় গিয়েছিল পড়তে, পি.এইচ.ডি. শেষে এখন যোগ দিয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সি.ডি.আর.সি.তে।

জন হপকিন্সে ওর পড়ার বিষয় ছিল এপিডেমিওলজি বা রোগের-বিস্তার সংক্রান্ত বিদ্যা। আজকাল শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে নতুন নতুন রোগ। ফলশ্রুতিতে নিজের গবেষণা তো আছেই, অনেক সহকর্মীর গবেষণাতেও নজর বোলাতে হয় ওকে। তাই পেশাগত দিক থেকে ওকে সফল বলতেই হয়।

ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপার আলাদা।

প্রথম প্রেম নিতুর কাছ থেকে কষ্ট পাবার পর, নতুন করে আর কারও দিকে মুখ তুলে চায়নি ও। বাঙালী কবিরা নানাভাবে বাঙালী নারীর রূপের গুণের বর্ণনা করে গিয়েছেন। তারা সম্ভবত কোনদিন বিদেশে গিয়ে দেখে আসেননি। নইলে বাঙালী পুরুষ, যদি লম্বা হয় আর স্বাস্থ্য সচেতন হয় আরকি, অন্যদের চোখে কীভাবে ধরা পড়ে তার বিস্তারিত অনেক বর্ণনা আমাদের সামনে থাকত। রাফসান লম্বায় ভালোই, দেখতে-শুনতেও মন্দ নয়, চোখে-মুখে মায়া। লোকে বলে, এই মায়া নাকি উপমহাদেশের বৈশিষ্ট্য-এখানকার সবাই অপুষ্টিতে ভোগে বলে!

সে যাই হোক, এই মায়া যে নজরকাড়া, তাতে তো আর কোন সন্দেহ নেই!

আমেরিকা থাকতেও প্রেমের নানা প্রস্তাব পেয়েছে রাফসান। কখনও আমেরিকানদের কাছ থেকে তো কখনও আফ্রিকানদের কাছ থেকে। কানে তোলেনি। ওর একমাত্র চিন্তা ছিল তখন লেখা-পড়া।

দেশে ফিরে এসেও নানাভাবে বিয়ের কথা শুনতে হয়েছে ওকে। আব্বা-আম্মা তো সরাসরিই বলেছিলেন, বলিয়েছিলেন রিমুকে দিয়েও। কিন্তু সেসবও কানে তোলেনি। বিশেষ করে আব্বু, প্রখ্যাত ডা. সেলিম যখন শয্যা নিলেন, তখন জোর চাপ দেয়া হয়েছিল ওকে। টলেনি রাফসান।

প্রায় ছয় মাস রোগে ভুগে মারা গেলেন ডা. সেলিম। ডাক্তার, সে যত দক্ষ বা যত নামকরাই হোক না কেন, দিন শেষে তো মানুষই। একদিন না একদিন তাকেও মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতেই হয়।

এরপর থেকেই কাজের মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে ও। ল্যানসেট, নিউ ইংল্যান্ড, প্লস ওয়ানসহ বড় বড় সব জার্নালে ছাপা হয়েছে ওর লেখা। ডানে-বাঁয়ে ফিরে তাকায়নি কখনও।

আজ-কাল মাঝে মাঝেই বিষণ্ন সময় কাটে বেচারার। আব্বার কথা, নিতুর কথা, আর বিশেষ করে আদনানের কথা মনে পড়ে খুব করে।

এখনও চোখ বন্ধ করলে ছেলেটার রক্তাক্ত চেহারা দেখতে পায় সে, এখনও দেখতে পায় ছেলেটার দুষ্টুমি ভরা হাসি। রাতে কাঁপতে কাঁপতে অহরহ ভেঙে যায় ঘুম।

আমেরিকায় ব্যায়াম করার অভ্যাসটা পোক্ত করেছিল। আজ-কাল জিমে যাবার সময় পায় না। তাই সকাল সকাল উঠে অনেকটা রাস্তা দৌড়ে নেয়। সমস্যা হলো, জিমে ব্যায়াম করা দেহ শুধু দৌড়-ঝাঁপে মানতে চায় না। তার দরকার আরও শক্তিক্ষয়। তাই দেহের মধ্যাঞ্চলে হালকা একটু স্ফীতভাব লক্ষ্য করছে আজ ক'দিন হলো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নরম তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে বারান্দায় এসে বসল

রাফসান। সকালে প্রায় দেড় ঘন্টা দৌড়ে ব্যয় করেছে। এখন ফ্যানের নিচে বসলে বা গোসলে ঢুকলে ঠান্ডা লেগে যাবে। তাই ঘাম একটু শুকিয়ে নেয়া দরকার।

ওর ফ্ল্যাটটা ঢাকা শহরের অন্যতম দামী জায়গা, গুলশানে হলেও, সামনে বেশ অনেকটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে। বাচ্চারা দিনের বেলা ওখানে খেলে। অবশ্যই ক্রিকেট, ফুটবল কম সময়ের উত্তেজনাকর খেলা হলেও, বাংলাদেশে ক্রিকেটেরই জয়জয়াকার। কে জানে, সামনে খেলতে থাকা বাচ্চাদের মাঝ থেকে বেরিয়ে আসবে ভবিষ্যতের মাশরাফি, সাকিব অথবা তামিম!

বাচ্চাদের খেলা দেখতে ভালোই লাগে। প্রায়শই দেখা যায়, কে ব্যাটিং করবে আর কে বোলিং, সেই চিল্লাপাল্লা লেগে খেলাই ভন্ডুল হয়ে গিয়েছে। এমনিতেই ব্যস্ত সময়ে সকালে খেলার সময় পায় না বাচ্চারা। শুধু ছুটির দিনে যা একটু সময় মেলে। আজ শুক্রবার, স্কুল ছুটি। তবে রাফসানের ছুটি নেই। আর দশটা চাকরির মতো যে নয় ডাক্তারি, তার সাথে গবেষণা যোগ হলে তো কোন কথাই নেই। এখনও চারটা প্রজেক্ট চলছে ওর, প্রজেক্টের আন্ডারে ভর্তি রোগীদের দেখে আসতেই হবে।

খানিকক্ষণ খেলা দেখে গোসল সেরে নিল রাফসান, আগেই স্যুট-বুট বের করে রাখা আছে। গোসল থেকে বেরিয়ে পরে নিল সেগুলো। এরপর খাওয়া-দাওয়া সেরে আম্মার ঘরে ঢুকল।

স্বামী মারা যাবার পর, মিসেস রোখসানা একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছেন। রাতে তারও ঘুম হয় না। জীবন অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়েছে তার। দাম্পত্য জীবনে স্বামীকে খুব একটা বেশি কাছে পাননি, অথচ তিনি চলে যাবার পর যেন তার অভাবটা আরও বেশি করে বোধ করছেন। ফজরের আজান ঘুম ভাঙায় তার। এরপর নামাজ পড়ে খুলে বসেন কোরআন শরীফ। নাস্তা খাবার আগে আর ওঠেন না। বাড়ির কাজ দেখার জন্য লোক রেখে দিয়েছেন, সেই দেখে সব কিছু। প্রতিদিন সকালের নাস্তা আর রাতের খাবারটা তাই বাড়িতে খাওয়ার চেষ্টা করে রাফসান। নইলে হয়তো সারাদিন মায়ের সাথে দেখাই হবে না।

তবে অধিকাংশ দিন চুপচাপে খাওয়া সারে দু'জন। টুকিটাকি কথা হয় কখনও, কখনও হয় না। আজ হলো না। খাওয়া শেষে কফির কাপ টেনে নিল রাফসান। ওটা শেষ করে যখন চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে, তখন বেজে উঠল কলিংবেল।

'কে এল!' বলতে বলতে উৎসুক চোখে দরজার দিকে তাকাল রাফসান। উঠতে হলো না ওকে, কাজের বুয়া গিয়েই খুলে দিল দরজা।

ঝামেলা হয়েছে কোন, মনে মনে বলল রাফসান। কেননা দরজা খুলে দিয়েই সটান দাঁড়িয়ে গেল বুয়া। কোন কিছু দেখে চমকে না গেলে অমনটা হবার কথা না।

বিড়বিড় করতে করতে উঠে দাঁড়াল ও, ভয় পায়নি একবিন্দুও। পুলিসের চাকরী ছেড়েছে তা-ও বছর পাঁচেক হয়ে গিয়েছে। তবে এখনও অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে। একবার ভাবল, শোবার ঘরের দিকে এগোবে কিনা। সরকারি অস্ত্র জমা দিয়েছ বটে, কিন্তু সরকারি ট্রেনিং তো আর জমা দেয়নি! নিজের নামে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স আগেই করিয়ে রেখেছে। একটা ওয়ালথার পি.পি.কে. আছে বাসায়। প্রতিদিন না হলেও, সপ্তাহে দু'বার অন্তত পরিষ্কার করে অস্ত্রটা। আর মাসে একবার শুটিং ক্লাবে গিয়ে হাতের টিপ ঠিক করে আসে।

অবশ্য এখন আনা-না আনা সমান কথা। যদি কোন বিপজ্জনক কেউ দরজায় এসে থাকে, তাহলে ও শোবার ঘরে পৌঁছাবার আগেই যা হবার হয়ে যাবে। আর নইলে তো অস্ত্রটার দরকারই নেই।

মুচকি হাসতে হাসতেই এসব ভাবল রাফসান। ডাক্তারি জীবন ওকে সম্মান এনে দিয়েছে। কিন্তু রোগী দেখতে হয় না বললেই চলে, তাই উত্তেজনা বলে যে একটা কথা আছে, সেটা প্রায় ভুলতেই বসেছে ও। আমেরিকা থাকতে মাঝে মাঝে জিমে গিয়ে, মাঝে মাঝে বক্সিং ক্লাবে গিয়ে শিরায় অ্যাড্রেনালিনের প্রবাহটা বাড়িয়ে আনত সে। কিন্তু এখন তো আর সেই সুযোগ নেই। তাই অল্পতেই অনেক বেশি চিন্তা করে ফেলে।

শুয়ে-বসে দেহের পাশাপাশি মাথাতেও মেদ জমাতে শুরু করেছে রাফসান।

যাই হোক, উৎসুক চোখে দরজার দিকে এগোল সে। এদিকে বুয়া তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রায় দশ সেকেন্ড পর দরজা খুলে সরে এল মহিলা। রাফসানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাইজান, পুলিস।' ভয়ে গলা দিয়ে বেচারির কথা বেরোতে চাইছে না। নতুন কাজে রাখা হয়েছে বলে ওর 'ভাইজানের' অতীত পরিচয়ও জানা নেই। 'আপনারে চায়।'

শান্ত হয়ে গেল রাফসানের স্নায়ু। পুলিস ছুঁলে আঠারো ঘা-বাংলাদেশের মানুষের সেটাই বিশ্বাস। কিন্তু নিজে এককালে এ.এস.পি. ছিল বলে ও ভালো করেই জানে- অধিকাংশ পুলিসই সৎ আর ভদ্র। দেহের অন্য সব পেশার মতো এই পেশারও নাম খারাপ করেছে গুটিকতক কিছু অসাধু কর্মকর্তা আর দেশের সিস্টেম। দরজার দিকে এগিয়ে গেল ও।

কী আশ্চর্য! দরজার ওপাশে অপেক্ষা করছেন ওর-ই এককালে বস, সৈয়দ মারুফ।

রাফসানকে দেখে হাসি ফুটে উঠল তার চেহারায়। ও চাকরি ছাড়ার পর, খুব একটা বেশি দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। অবশ্য এর পেছনে সৈয়দ মারুফের পদোন্নতিও একটা বড় কারণ। বর্তমানে তেজগাঁও জোনের দায়িত্বে আছেন তিনি, উপ-

কমিশনার পদে। জলপাই রঙের পূর্ণ উর্দি পরে এসেছেন আজ। একেবারে ছোটখাটো জিনিসও বাদ দেননি। এমনকি কোমরের পাশে ঝুলছে পুলিস ইস্যু কালো বন্দুক! সদাহাস্য লোকটার চোখজোড়ায় কেমন যেন দুশ্চিন্তা আর বিষাদের ছাপ দেখতে পেল রাফসান।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে ভদ্রলোককে বসার ঘরে বসাল সে। তবে তার আগে একবার দেয়ালঘড়ি দেখে নিতে ভুল করল না। শনিবার রাস্তা ফাঁকাই থাকে। ঘড়িতে এখন আটটা। আধা-ঘন্টা পর রওনা দিলেও অসুবিধা নেই কোন।

বেচারার জানা নেই, এখন ভাগ্যের বোনা যে জালে জড়াতে চলেছে, তা ওর সামনের কয়েক সপ্তাহের পরিকল্পনা একেবারে ভেস্তে দেবে!

I

অজ্ঞাত কাল আগের কথা

অনেকক্ষণ মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে রাখার পর, আস্তে আস্তে সোজা হয়ে বসল ওয়াজেথ।

আটাশ বছরের যুবক এই মিশরীয়ের আসল নাম অবশ্য ওয়াজেথ না, ঠিকঠাকভাবে উচ্চারণ করলে যে নাম দাঁড়াবে, তা লেখা সম্ভব না অক্ষরেও। তবে কাছাকাছি যাওয়া যায়, পের-ওয়াদজেঠথ। বেশ ভারী একটা নাম, জন্মস্থানের নামানুসারে রাখা হয়েছে। অর্থটাও দারুণ, ওয়াজেঠথ দেবীর আলয়।

নাম যতই সুন্দর আর অর্থবহ হোক না কেন, এই বাঙ্গাল মুলুকের কারও জিহ্বার আগায় তা আসে না। আর নামের বিকৃতি ঘটার চাইতে, নাম পরিবর্তন করে নেয়াই ভালো!

তাই চম্পক নগরীর আপামর জন সাধারণের কাছে ওর নাম–ওয়াজেথ।

মাটির এক তলা বাড়িটাতে ঘর মাত্র তিনটি। একটায় ও ঘুমায়, একটায় খায় আর অন্যটা আলাদা করে রেখেছে প্রার্থনার জন্য। বিয়ে-থা করেনি এখনও, অবশ্য স্থানীয় মেয়েরা ওকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টাও কম করেনি। মেয়েদের দোষ দিয়েই বা লাভ কী? সম্ভ্রান্ত বংশের ছাড়া এমন ছয় ফুট লম্বা, সুদর্শন যুবক দেখা যায় নাকি?

জন্ম ওর মিশরের পের–ওয়াদজেঠথ শহরে, তবে বর্তমানে বাস করতে হচ্ছে চম্পক নগরীতে। তবে বড় হয়েছে পের-ওয়াদজেঠথ থেকে অল্প কিছুটা দূরের এক মরূদ্যানে। বাপ-মা আর পাঁচ ভাইবোনের সাথে আরামে না হলেও, আয়েশেই কাটছিল দিন কাল। কিন্তু সুখ কপালে সইল না। একদিন বেদুঈন দস্যুরা আক্রমণ চালাল ওদের গ্রামে। ছোট ছোট বাচ্চা আর যুবতী মেয়েদের আলাদা করে, অন্য সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করল! এরপর বেচে দেয়া হলো ওদেরকে।

ওয়াজেথ, আপাতত এখানে এ নামেই তাকে ডাকা হোক, পোড়া কপাল নিয়ে জন্মেছিল বলেই মনে হয়। তবে স্রষ্টা সম্ভবত শেষ মুহূর্তে দয়া পরবেশ হয়েছিলেন। তাই পারস্যের এক বিখ্যাত বণিকের ব্যক্তিগত দাসে পরিণত হয় সে। অন্যান্যদের ভাগ্য ততটা ভালো ছিল না। ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে তারা হয় মিশরের আর নয়তো পারস্য অন্যান্য কামুক ধনীদের লালসার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল।

ওয়াজেথের মালিক অন্য ধরনের মানুষ, তিনি দাসদের প্রতি অস্বাভাবিক সদয় আচরণ করতেন। অনেকে বলে, আসলে তার মা ছিল এক দাসী। কিন্তু তার বাবা সেটাকে গোপন রেখে নিজের আর তার স্ত্রীর সন্তান বলেই চালিয়ে দিয়েছিলেন

জারেক্সকে। তবে জারেক্স সবই জানতেন। তাই পরবর্তীতে তিনি যখন পিতার সম্পত্তির মালিক হন, তখন দাসদের সাথে সদয় ব্যবহার করেন।

খলের যুক্তির অভাব হয় না। জারেক্সের ভালোমানুষি আর সম্পদকে ঈর্ষার বিষে নীল হয়ে যাওয়া লোকগুলোরও হয়নি।

যদি কথাটা সত্যি না-ই হবে, তাহলে জারেক্সের জন্মের দুই মাসের মাথায় তার মা, মানে পিতার স্ত্রী আত্মহত্যা করবেন কেন? এই হলো তাদের যুক্তি।

যেহেতু নাটকের কুশীলবরা কেউই এখন আর বেঁচে নেই। তাই ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়েই বা কী লাভ? উত্তর তো আর মিলবে না।

যাই হোক, আসল কথা হলো-জারেক্স মানুষ হিসেবে ভালো, আর মনিব হিসেবে অসাধারণ।

লোকটা নিজেও ছিলেন নিঃসন্তান, তাই যেন ওয়াজেথকে সবসময় কাছে রাখতেন। হাতে ধরিয়ে শিখিয়েছেন ব্যবসা-বাণিজ্য। বছর কয়েক ঘুরতেই দেখা গেল, জারেক্সের ব্যবসার অর্ধেক দেখ-ভালের ভার এসে পড়েছে তরুণের উপর!

নিজেও মনিবকে অসম্ভব ভালোবাসত আর শ্রদ্ধা করত ওয়াজেথ, তাই কখনও কাজে গাফলতি করেনি। বয়স যখন ওর একুশ, তখন থেকে সমুদ্রপথেও জারেক্সের সাথে ভ্রমণে অংশ নিতে শুরু করে।

এমনই এক ভ্রমণে ঘটে যায় বিপর্যয়। তখনকার দিনে তো আর এখনকার মতো ম্যাপ-চার্ট এসব ছিল না। তাই আন্দাজেই জাহাজ চালাতে হতো ক্যাপ্টেনকে। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ক্যাপ্টেনরা তা করতেনও। সমস্যা হতো যখন প্রলয়ঙ্করী কোন ঝড়ে পড়ত জাহাজ, তখন। অনেক সময় দেখা যেত, ঝড়ের প্রকোপে দিক হারিয়ে জাহাজ ভেসে বেড়াচ্ছে পানিতে। কোথায় যাচ্ছে, সামনে কী আছে-এসব ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই ক্যাপ্টেনের।

এই ভ্রমণেও তাই হলো। সাগরে জাহাজ ভেড়ানোর ঠিক সপ্তম দিনের মাথায় উঠল ঝড়। সেই উথাল-পাথাল ঝড়ে, দিক-টিক সব গুলিয়ে গেল ক্যাপ্টেনের। পাঁচ দিন পর যখন ঝড় থামল, তখন দেখা গেল সমুদ্রের ঠিক মাঝখানে ভাসছে জাহাজ। রাত নামার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে শুরু করল সবাই। হয়তো আকাশে তারার অবস্থান থেকে তাদের নিজের অবস্থান বোঝা যাবে।

কিন্তু না, সবাইকে হতাশ করল ক্যাপ্টেন রুস্তম। জানাল, তার পরিচিত বা তার কাছে থাকা ম্যাপের সাথে আকাশের তারার অবস্থান মেলে না।

শুরু হলো আস্তো ভিদাতের সাথে লড়াই। মৃত্যু না স্থল, কোনটা আগে আসে তা দেখার প্রতীক্ষা। যদি খাবার আর পানি শেষ হয়ে যাবার আগে স্থল না পাওয়া যায়, তাহলে আস্তো ভিদাতের ফাঁস এসে লাগবে গলায়।

ঝড়ের কবলে পড়ে বিশ জনের দলটার সংখ্যা এমনিতেই নেমে এসেছিল নয়-এ। এখন আস্তে আস্তে সেটা আরও কমতে শুরু করল।

প্রথমেই ঝড়ে পড়ল বয়স্করা। সেটাই স্বাভাবিক। জারেক্স ছিলেন এদের মাঝে। কোনদিন কষ্ট সহ্য করতে হয়নি যে দেহকে, সে দেহ কষ্টের মাঝে টিকতে পারবে- এমনটা আশা সম্ভবত তিনিও করেননি।

নয় থেকে কমতে কমতে যখন তিন-এ নামল জীবিতদের সংখ্যা, তখন শুরু হলো বিপদ।

ঝামেলা যে একটা পাকতে যাচ্ছে, তা আরও আগে থেকেই বুঝতে পারছিল ওয়াজেথ। পুরো জাহাজে বেঁচে আছে কেবল ও, ক্যাপ্টেন আর দারিয়ুস। ক্যাপ্টেন আর দারিয়ুসের মাঝে অনেক দিনের পুরনো সম্পর্ক। একসাথে জাহাজ ভাসিয়েছে কম করে হলেও এক দশক। আর তাই প্রথম প্রথম ওদের এক হয়ে গুজুর গুজুর করাটাকে সন্দেহের চোখে দেখেনি ওয়াজেথ।

এদিকে জাহাজ আরব সাগরে ভেসে চলছে উদ্দেশ্যহীনভাবে, মুখ সম্ভবত দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। ধীরে ধীরে কমে আসছে পানি, খাবার, রসদ। সেই যে ঝড় বন্ধ হয়েছে, তারপর আর এক ফোঁটা বৃষ্টিও হয়নি। স্বভাবতই, টান পড়েছে সবকিছুতে। দুই ক্ষুদার্ত মুখের তাই আস্তো ভিদাতকে ফাঁকি দেয়ার সম্ভাবনা বেশি। তিন মুখ থাকলে? একেবারেই কম। অবশ্য এক মুখ হলে সেই সম্ভাবনাটা বেড়ে যায় কয়েকগুণ। থাক, আগে একটু তো বাড়ুক সুযোগ।

তারপর নাহয়...

সেই ভাবনা থেকেই একদিন আচমকা ডেকের উপর হন্টনরত ওয়াজেথের উপর তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রুস্তম-দারিয়ুস।

ওয়াজেথ নিজেও কম চালু না। হোক না মনিব ভালো, কিন্তু আদপে তো সে একজন দাস। পনেরো বছর থেকে দাসত্বের বোঝা বয়ে বেড়ানো যুবক ভালোভাবেই জানে তির্যক দৃষ্টির আর ফিসফিসানি আলোচনার অর্থ। আর তাছাড়া, জীবিতের সংখ্যা কমাবার চিন্তা যে ওর মাথায় খেলে যায়নি, সে কথা বললেও ভুল হবে। আর তাই বাড়তি সতর্কতা হিসেবে কোমরে পারস্যের যুবকদের কাছে জনপ্রিয় দু'ধারী তলোয়ার ঝোলাতে শুরু করেছে। তা-ও আবার সেদিন সকাল থেকেই, হয়তো সেজন্যই ওর হাতে অস্ত্রটা দেখে চমকে উঠল দুই আক্রমণকারী। এক পা পিছিয়ে এল একটু। ভেবেছিল, ফাঁকা মাঠে গোল দেবে। কিন্তু গোল রক্ষক যে দাঁড়িয়ে আছে, তা আঁচ করতে পারেনি!

মেঘহীন দিনের বেলায় সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে তলোয়ার। সূর্যের দিকে মুখ দিয়ে আছে ওয়াজেথ, আলোর ঔজ্জ্বল্যে দেখতে একটু কষ্টই হচ্ছে ওর। কিন্তু

যখন বুঝতে পারল যে আক্রমণ হতে যাচ্ছে, নিজের তলোয়ারে সেই আলো প্রতিফলিত করে ফেলল দারিয়ুসের চোখে। একসাথে দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেও তাই ব্যর্থ হলো সে প্রচেষ্টা।

তবে ক্যাপ্টেনের থামার কোন কারণ নেই। এগিয়ে এসে ওর হৃদপিণ্ড বরাবর চালিয়ে দিল নিজ তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ফলা।

তলোয়ারের খেলায় ওয়াজেথ একেবারে ফেলনা নয়, দক্ষতার সাথে নিজের তলোয়ার দিয়ে আঘাতটা এক পাশে সরিয়ে দিতে পারল ও। কিন্তু ক্যাপ্টেনও কম যায় না, সাথে সাথে পাশ থেকে কোপ দেয়ার ভঙ্গিতে আবার আঘাত হানল। পরপর দুটো এমন মারণ আঘাতকেও আয়াসের সাথে থামিয়ে দিল ওয়াজেথ।

এরপরই শুরু হলো আসল হামলা, কেননা দারিয়ুস ততক্ষণে সামলে নিয়েছে নিজেকে। সে-ও যোগ দিল জীবন-মৃত্যুর এ খেলায়। দ্বিতীয়বার আঘাত হেনে ক্যাপ্টেন একটু সরে যেতেই সে জায়গাটা দখল করে নিল সে। হাতের তলোয়ারটা একদম সোজা চালিয়ে দিল।

চোখের কোনা দিয়ে শত্রুর উপর নজর রাখছিল ওয়াজেথ, এক পা পিছিয়ে এসে আত্মরক্ষা করল সে। না হলে পাকস্থলীতে ইয়া বড় এক ছিদ্র নিয়ে ডেকে পড়ে থাকতে হতো ওকে। এরপর পাশ থেকে আসা আঘাতটা ঠেকিয়ে দিল তলোয়ার দিয়ে। দেহটাকে এক পাক দিয়ে ঘুরিয়ে আনল, ফলে জায়গা পরিবর্তন হলো দুই যোদ্ধার। দারিয়ুসের আগের অবস্থানে এসেই প্রথম আঘাতটা হানল ওয়াজেথ, শত্রুর মতোই পাকস্থলী লক্ষ্য করে আঘাত হানল ও। দারিয়ুসের তলোয়ার সেটাকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে দিল না।

ক্যাপ্টেন ঘাগু লোক, অনেক যুদ্ধ দেখেছে। লড়েছেও অনেক যুদ্ধে। আর পুরনো দিনের সহকর্মীর সাথে বোঝাপড়াও আছে। এমনটা হতে পারে তা আগেই ধারণা করেছিল সে। তাই একটু সামনে এসে সুবিধাজনক জায়গা করে নিয়েছে। দারিয়ুস আর ওয়াজেথের তলোয়ার আলাদা হতেই যার যার অবস্থান থেকে একটু সরে দাঁড়িয়েছে দুই যোদ্ধা। যুবকের দেহ এখন ক্যাপ্টেনের হাতের নাগালে। কালক্ষেপণ না করে তার উরু লক্ষ্য করে আঘাত হানল রুস্তম। সরে আসতে গিয়ে ওয়াজেথের তলোয়ার উপরে উঠে এসেছে, তাই মাথা লক্ষ্য করে আঘাত হানলে কোন লাভ হতো না।

আফসোস, হিসেব করতে একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল ক্যাপ্টেনের। আর তাই মাংসের গভীর না গিয়ে, শুধু চামড়া স্পর্শ করেই ফসকে গেল তার তলোয়ার। যুবকের উরু থেকে উষ্ণ শোণিত গড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

হিসেবে ভুল করায়, তলোয়ার চালাবার ফলে সৃষ্ট জড়তা ক্যাপ্টেনকে বাধ্য করল এক পা সামনে এগিয়ে আসতে। আর সে কারণেই বেঁচে গেল ওয়াজেথ। দারিয়ুস আঘাত হেনে ঝামেলা শেষ করার জন্য তলোয়ার উঠিয়েছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন মাঝখানে এসে পড়ায় সেই চিন্তা বাদ দিতে হলো।

সৌভাগ্যের স্পর্শে উপহার হিসেবে পাওয়া এই দুইটা মুহূর্তের মাঝেই নিজেকে সামলে নিল ওয়াজেথ। আঘাত খুব কড়া বলে মনে হচ্ছে না, চামড়ার গভীরে যেতে পারেনি তলোয়ার।

তবে রক্তের দেখা ওকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। সাথে সাথে ডান-বাঁয়ে তলোয়ার চালাতে শুরু করল ও, লক্ষ্য ক্যাপ্টেন। গায়ের জোরে হানা তৃতীয় আঘাতটাও লোকটা যখন ঠেকিয়ে দিল, তখন নতুন এক উপায়ে এগোল ও। বাঁ হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল ক্যাপ্টেনের ডান হাত। নিজের তলোয়ার ধরা ডান হাত সর্বশক্তিতে এগিয়ে দিল ক্যাপ্টেনের চেহারার দিকে।

তলোয়ার লড়াইতে অভিজ্ঞ হলেও, হাতাহাতি লড়াই-এ খুব একটা দক্ষ না ক্যাপ্টেন। বেচারা নাবিক থাকা অবস্থায় প্রায়শই মারামারি করত বটে, কিন্তু ক্যাপ্টেন হবার পর আর ওসব কাজে হাত নষ্ট করতে হয়নি। অনভিজ্ঞতা অথবা দীর্ঘদিন ধরে চর্চা না থাকার ফল ভোগ করতে হলো তাই।

যথেষ্ট দ্রুত নড়ে উঠতে না পারায়, ওয়াজেথের তলোয়ারের হাতল এসে গুঁড়িয়ে দিল লোকটার নাক। টলে উঠল তার দুনিয়া, রক্তে চেহারা ভেসে গেল নিমিষে। ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল।

সেটাই হয়তো ভালো হলো তার জন্য। আস্তো ভিদাতের কাছে ওকে পাঠিয়ে দেবার জন্য চালানো তলোয়ারের ফলাটার লিক লিক করে ওঠা দেখতে হলো না।

হৃদপিণ্ডে মস্ত বড় এক ক্ষত নিয়ে ডেকের উপর আছড়ে পড়ল রুস্তম ক্যাপ্টেন।

বসের এই অবস্থা দেখে ভড়কিয়ে গেছে বেচারা দারিয়ুস। ক্যাপ্টেন সাহেব ওর দেখা সেরা তলোয়ারবাজ। তারই যখন এই অবস্থা তখন...

কিন্তু পিছিয়ে আসাটাও যে অসম্ভব!

আহুরা মাজদার নাম নিয়ে এগিয়ে গেল ও।

উচ্চতায় দারিয়ুস খাটো। গরীব ঘরে জন্ম ওর। বেড়ে ওঠার সময়টায় না পেয়েছে পর্যাপ্ত খাবার আর না পেয়েছে পর্যাপ্ত পুষ্টি। এদিকে মিশরীয় ওয়াজেথের বড় হয়ে ওঠা জারেক্সের প্রাসাদে। যেখানে খাবারের নেই কোন কমতি। প্রায় এক মাথা লম্বা তাই সে দারিয়ুসের চাইতে।

দুই যোদ্ধা এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল একে অন্যের দিকে।

'ক্যাপ্টেন বলছিলেন যে...' শুরু করতে গেল দারিয়ুস। আশা, যদি পার পেয়ে যাওয়া যায়।

বিদ্রূপের হাসিতে ফেটে পড়ল ওয়াজেথ। দারিয়ুস বুঝে গেল, খোদ আস্তো ভিদাত দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে।

যা আছে কপালে ভেবে এক পা এগিয়ে এসে আঘাত হানল দারিয়ুস। কে জানে, ভয় না পেলে হয়তো জিতেই যেত ও। আকারের খামতিটা পুষিয়ে নিতে পারল অমানুষিক শক্তি দিয়ে। কিন্তু চোখের সামনে রুস্তমের মৃত্যুটা ওকে ভীত খরগোশ বানিয়ে ফেলেছে।

আয়াসের সাথে ডান দিক থেকে আসা আঘাতটা ঠেকিয়ে দিল ওয়াজেথ, বাম দিকেরটা থামাতেও বেগ পেতে হলো না। হয়তো আরও কিছুক্ষণ চালিয়ে যেত যুদ্ধ। কিন্তু পায়ের ক্ষতটা বড় ব্যথা করছে, রক্তপাত বেড়ে দুর্বল হয়ে পড়ে কিনা- এই ভেবে শেষ আক্রমণ চালাবার সিদ্ধান্ত নিল।

বাম দিকের আঘাত হেনে ব্যর্থ দারিয়ুস এবার দু'হাত কোপ দেবার ভঙ্গিতে মাথার উপর তুলল তলোয়ার, নামিয়েও আনল দক্ষতার সাথে। তারচেয়ে বেশি দক্ষতা দেখিয়ে আঘাতটাকে ব্যর্থ করে দিল ওয়াজেথ। পুরোপুরি না থামিয়ে একটু বাঁ-পাশে সরে গেল ও, তলোয়ারের পাশটা দিয়ে নামতে থাকা অস্ত্রটা অল্প একটু সরিয়ে দিল ডান দিকে। বাতাস কেটে ওটা নিজে নেমে যাবার সাথে সাথে খালি হাত দিয়ে শত্রুর হাতল ধরা দুই হাতে আঘাত হানল ও। একে তো লক্ষ্যভেদ হয়নি, তারপর ওয়াজেথের থাবা-দুইয়ে মিলে ডেকের সাথে গেঁথে গেল দারিয়ুসের দু'ধারী তলোয়ার। ভারসাম্য সামলাতে নিজেও এগিয়ে এল একটু।

ডেকের কাঠের সাথে তলোয়ার গেঁথে যাওয়ার আওয়াজটা শোনামাত্র দারিয়ুস বুঝতে পারল, জীবনের শেষ সূর্যোদয়টা দেখে ফেলেছে ও। সময়মত তলোয়ারটা বের করতে পারবে না। এক সেকেণ্ড হলেও সময় লাগবে ওর, আর শত্রুকে এমন লড়াইতে এক সেকেণ্ড সময় দেবার মতো বোকা না ওয়াজেথ।

আসলেই তাই, একটুও দেরি করেনি যুবক। দারিয়ুসের হাতে আঘাত হানার সাথে সাথেই নিজের তলোয়ারটা ঠেলে দিয়েছে সামনে। ও জানে, তাল সামলাতে না পেরে সামনে ঝুঁকবেই লোকটা।

দারিয়ুসের পেট এফোঁড়-ওফোঁড় করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে এল তলোয়ারের ফলা। বেচারার মুখ দিয়ে যেন রক্তের বাণ ছুটল।

চোখ তুলে হত্যাকারীর দিকে তাকাল দারিয়ুস, চোখে কী যেন প্রার্থনা। বোঝাবার আকুল আপ্রাণ।

ধুঁকে ধুঁকে মরতে চায় না ও, চায় দ্রুত মৃত্যু।

'তাই হোক,' শত্রুর কানে ফিসফিস করে বলল ওয়াজেথ। বুকে ধাক্কা দিয়ে খুলে আনল তলোয়ার। এদিকে দারিয়ুসের হাত থেকে ওর নিজের তলোয়ারের হাতল ছুটে গিয়েছে। সব ধরনের অবলম্বন হারিয়ে হাঁটু গেড়ে ডেকের উপর আছড়ে পড়ল বেচারা।

'শান্তিতে মরো।' বলে তলোয়ারের এক আঘাতে দারিয়ুসের গর্দান কেটে ফেলল ওয়াজেথ।

জাহাজে একমাত্র জীবিত প্রাণী বলতে এখন ও একা!

তিন

চুপচাপ কিছুক্ষণ সোফার উপরে বসে রইলেন সৈয়দ মারুফ।

উসখুস করতে শুরু করল রাফসান, অবশ্য লাভ নেই কোন। কথা গুছিয়ে নেবার আগে মুখ খুলবেন না সৈয়দ সাহেব।

'গতকাল রাতে,' ভদ্রলোকের এই ব্যাপারটা ভালো লাগে রাফসানের। সরাসরি কাজের কথায় এসে পড়েন, সময় নষ্ট করা তার ধাতে নেই। 'তোমাদের প্রতিষ্ঠানে একটা খুনের ঘটনা ঘটেছে!'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল রাফসান, বলে কী!

'ঠিকই শুনেছ,' ওর হতভম্ব অবস্থা টের পেলেন মারুফ সাহেব। 'তা-ও আবার একটা না...দুটো। একজন সিকিউরিটি গার্ড আর অন্যজন বিজ্ঞানী। আমাদের ধারণা, ওই বিজ্ঞানীই ছিলেন আসল টার্গেট। সিকিউরিটি গার্ডকে খুন করা হয়েছে পথের কাঁটা সরাবার জন্য।'

কথাগুলো হজম করতে একটু কষ্টই হচ্ছে রাফসানের। কয়েকদিন পর পর নতুন করে সব সিকিউরিটির ব্যবস্থা নেয়া হয়। টাকাও খরচ করা হয় দেদারছে। সেখানে এমন ঘটলে তো বিপদ! এমনিতেই বিদেশী ফান্ডিং কমে আসছে। তার উপর যদি এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে আর দেখতে হবে না।

একইভাবে সম্ভবত পুলিস কর্মকর্তা সৈয়দ মারুফ আর সি.ডি.আর.সি.-র চীফ সায়েন্টিস্ট, সাজিদ রহমানও চিন্তা করছেন। অন্তত ভদ্রলোকের পরের কথায় তেমনটাই মনে হলো। 'আমরা আপাতত প্রেসকে দূরে রেখেছি। নিহত বিজ্ঞানীর নাম উমা চক্রবর্তী। তার বাবা প্রীতম চক্রবর্তী-'

'আমি স্যারের নাম শুনেছি, বিখ্যাত ফার্মাকোলজিষ্ট তিনি।' সৈয়দ মারুফকে থামিয়ে বলে উঠল রাফসান।

'হুম,' মাথা নেড়ে মেনে নিলেন তিনি। 'নিজেও বিজ্ঞানী হওয়ায় আপাতত চুপ থাকার অনুরোধ মেনে নিয়েছেন। তবে দুই-তিন দিনের বেশি চুপ থাকবেন বলে মনে হয় না। যে সিকিউরিটি গার্ড মারা গিয়েছে, সে অনাথ। তাই তাকে নিয়েও সমস্যা হবে না।' সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন তিনি। 'ব্যাপারটার গুরুত্ব নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?'

তা পারছে রাফসান। উমা মেয়েটাকেও সে ভালো করেই চেনে। আদর্শবাদী,

কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক; তবে প্রচণ্ড প্রতিভাবান এক বিজ্ঞানী। কাজ করে ওর সাথেই। তবে অফিস আলাদা। রাফসানের অফিস তিন তালায়। আর উমা বসে...মানে বসত, নিচতলায়। যতদূর শুনেছে, নতুন কিছু একটা আবিষ্কার করেছিল মেয়েটা। কী, তা বলেনি কাউকে। শুধু সে জানত আর সাজিদ রহমান জানতেন। আজকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটা সেমিনারে যাওয়ার কথা ছিল মেয়েটার। সেখানেই প্রথমবারের মতো সারা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরার কথা ছিল নিজের আবিষ্কার। ভাসা ভাসা ভাবে শুনেছে-এই নয়া আবিষ্কার নাকি ওষুধ শিল্পের চেহারাই পালটে দেবে। কথাটা অবশ্য খুব একটা বিশ্বাস করেনি রাফসান। উমা মাইক্রোবায়োলজিষ্ট, ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া নিয়ে কাজ। রিকম্বিনেন্ট ডি.এন.এ. বা এই টাইপ ছাড়া ওর গবেষণার সাথে ওষুধ শিল্পের খুব একটা সম্পর্ক থাকার কথা না।

যাই হোক, মারা গিয়েছে মেয়েটা। তাই বৈজ্ঞানিক হিসেবে প্রথম যে প্রশ্নটা মাথায় আসার কথা ছিল, সেটাই করল ও। 'গবেষণার কাগজ-পত্র কোথায়? আছে সব ঠিকমতো?'

সোফায় হেলান দিয়ে বসলেন সৈয়দ মারুফ। 'নাহ।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন তিনি। 'তুমি কি ব্যস্ত? এতো উসখুস করছ কেন? কোথাও যাবার কথা থাকলে ক্যান্সেল করে দাও। লম্বা সময় কথা বলতে হবে।'

আধ-ঘন্টা পরের কথা। অফিসে যেতে দেরি হবে, এ কথা জানিয়ে বসার ঘরে ফিরে এল রাফসান। বুয়া এরইমধ্যে নাস্তা দিয়ে গিয়েছে। অবশ্য সেগুলো ছুঁয়েও দেখেননি সৈয়দ মারুফ। ওকে বসতে দেখে শুরু করলেন আবার।

'আমাদের সমস্যাটা সেখানেই। ভেতরে তেমন কাজের কোন ডকুমেন্ট খুঁজে পাওয়া যায়নি। গতকাল রাত বারোটার দিকে ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা সন্দেহ করছি। বন্ধ হয়ে যাবার পরও, অনেকক্ষণ অফিসেই থাকত এই বিজ্ঞানী। নিজস্ব গাড়ি ছিল বলে যাতায়াতে কোন অসুবিধা হতো না। প্রায় একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন তার বের হবার কোন লক্ষণ দেখতে পেল না ড্রাইভার, তখন খোঁজ নিতে শুরু করে। ওর চোখেই প্রথম ধরা পড়ে সিকিউরিটির লাশ। এরপর আরেকজন সিকিউরিটিকে খুঁজে বের করে বসের অফিসে ঢুকতেই দেখে, টেবিলের পাশে পড়ে আছে মেয়েটির মরদেহ।

'প্রায়শই ভেতরে ঢুকতে হতো তাকে। বিজ্ঞানীর নাকি শুচিবায়ু ছিল, বাসা থেকে খাবার আনাত। সেটা এনে দিতে হতো এই ড্রাইভারকেই। বাইরে থেকেও মাঝে মাঝে সালাদ আনিয়ে খেত নাকি।'

পুলিসের কর্মকর্তা দম নেবার জন্য একটু থামতেই রাফসান বলে উঠল। 'শুচিবায়ু নেই। থাকলে বাইরের খাবার খেতে পারত না। আমি যতদূর জানি, মেয়েটা শাকাহারী ছিল। আর জানেনই তো বাঙালীর স্বভাব, অন্যরকম কিছুই আমাদের সহ্য হয় না।'

মাথা নেড়ে মেনে নিলেন সৈয়দ মারুফ, সম্ভবত দুটো কথাই। 'যাই হোক, লোকটার ভাষ্য মতে, বিগত কয়েকদিন হলো তার ম্যাডামকে খুব শঙ্কিত মনে হচ্ছিল। অফিস থেকে সব কাগজ-পত্র সরিয়ে নাকি বাসায় নিয়ে গিয়েছিল সে। শুধু একটা ফাইল থাকত টেবিলের উপরে। লেখা-পড়া জানে না লোকটা, তাই ফাইলের নাম-ধাম কিছু বলতে পারেনি। এত টুকু নিশ্চিত করেছে যে দুপুরের খাবার দিতে যাবার সময় ওই ফাইলটা টেবিলেই পড়ে ছিল। এখন নেই।'

'ঘরের ভেতরটা-'

এবার রাফসানকে থামিয়ে দিলেন মারুফ। 'ফিঙ্গার প্রিন্টের জন্য দেখা হয়েছে কিনা? হয়েছে। এসব জ্ঞান অর্জনের জন্য তো তোমার কাছে আসিনি রাফসান।' পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন, কথাটা একটু কড়া হয়ে গিয়েছে। 'দুঃখিত, কিছু মনে করো না। চাপের মুখে আছি।'

মাথা নেড়ে রাফসান বোঝাল, ও কিছু মনে করেনি। চাপের মধ্যেই থাকার কথা। বাইরের বিশ্বে বাংলাদেশি গবেষণা-সংক্রান্ত যে-কয়টা প্রতিষ্ঠানের নাম আছে, তাদের মধ্যে সি.ডি.আর.সি. একটি। এখানে কোন ঝামেলা হলে সরকারের সবচেয়ে উঁচু মহল থেকে চাপ আসাটাও অস্বাভাবিক না।

'আমি কী করতে পারি, স্যার?' জানতে চাইল ও।

'তুমি তো জানোই, সরকারিভাবে আমাদের উপর খুব একটা ভরসা রাখা হয় না।' শুরু করলেন মারুফ। 'তাই তোমার সাহায্য দরকার। একে তো তুমি ওই প্রতিষ্ঠানেই চাকরি করো-আমাদের লিয়াজোঁ হতে পারবে। তার উপর ডন ওয়াসা আনুকে নির্মূল করার পেছনে তোমার যে কৃতিত্ব, সেটা উপরের মহলের এখনও স্মরণ আছে। তুমি যদি আমাদের কনসালটেন্ট হতে রাজি হও, তাহলে আমার ধারণা কেসটা আমরা পাব। এই কেস দুই-তিন দিনেই সমাধান করার মতো দক্ষতা যে তোমার আছে, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। সেই সাথে আমার পূর্ণ সমর্থন পাবে। এবারের অবস্থা তো আর সেই আগেরবারের মতো নেই। আমি সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করতে পারব। তাই আমার অনুরোধ, তুমি এই কেসে

কনসালটেন্ট হিসেবে থাকো।'

হতবাক হয়ে গেল রাফসান। এরকম কিছু আশা করেনি ও, অবশ্য করা উচিৎ ছিল। এই অনুরোধ ছাড়া ওর কাছে কেন আসবেন সৈয়দ মারুফ?

'কিন্তু, স্যার।' শুরু করল ও। 'গতবারের ব্যাপারটাকে আপনি কীভাবে সফলতা বলেন? মানছি, ডনকে শায়েস্তা করা গিয়েছিল। কিন্তু এর বিনিময়ে আমাদেরকেও তো একজন অফিসার হারাতে হয়েছে? তাই না। আর তাছাড়া ওসব অনেক আগের কথা। পাঁচ বছর ধরে এসবের সাথে নেই। মাথায় এখন কিছু খেলবে বলে মনে হয় না।'

'সেসব আমিও জানি। কিন্তু দেখ, গতবার কিন্তু তোমার প্রফেশনাল নলেজের কারণেই আমরা নাদু গুণ্ডার খুনিকে ধরতে পেরেছিলাম। এই কেসে তুমি লিড নিতে না চাও তো নিয়ো না। কিন্তু তোমার জ্ঞানটাকে তো ধার দাও। তোমার মতো বিজ্ঞানী আরও অনেকেই আছেন, মানছি সে কথা। কিন্তু তাদের কারও মাঠ-পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই। তাই অনুরোধ করছি আবারও, না করো না।'

অ্যাড্রেনালিনের প্রবাহ বেড়ে গিয়েছে রাফসানের দেহে। কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু এদিকে গবেষণা আর ওদিকে আদনানের ব্যাপারটা বাধা দিচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন সৈয়দ মারুফ।

'তোমার বসের সাথে আমি কথা বলে নেব। তিনি অমত করবেন না, প্রজেক্ট আছে তোমার শুনেছি। আশা করি ওগুলো সহকারীকে দিয়ে চালিয়ে নিতে পারবে। আর রইল বাকি আদনানের ব্যাপার-' একটু বিরতি দিলেন তিনি। 'এখন যদি আদনান উপস্থিত থাকত, তাহলে কী করতে বলত?'

'আরে ভাই,' উত্তর দিল রাফসান। 'ঝামেলা না করে রাজি হয়ে যান তো!'

আর কিছু বললেন না মারুফ।

'ঠিক আছে, আমি রাজি।' জানাল রাফসান। 'তবে আমার কিছু শর্ত আছে। এক, সরাসরি আপনার কাছে জবাবদিহি করব আমি। যদি আপনাকে কোন কারণে সরিয়ে দেয়া হয়, তাহলে আমিও থাকব না। দুই, আমি সর্বময় ক্ষমতা চাই। আমার আদেশ বিনা প্রশ্নে সবাইকে মানতে হবে। আর তিন, আমাকে সার্বক্ষণিক সঙ্গী দিতে হবে একজন। এস.আই. হলেই ভালো হয়।'

'আমিও তেমনটাই ভেবেছিলাম।' উত্তর দিলেন সৈয়দ মারুফ। 'আমি রাজি। আর আমার সাথে করেই নিয়ে এসেছি আমার দেখা সবচেয়ে চালাক এস.আই.কে,' মুচকি হাসলেন তিনি। 'তবে ওর সামনে কখনও বলিনি কথাটা। একটু মাথা গরম। যাই হোক-পরিচয় করিয়ে দেই, নিচেই দাঁড়িয়ে আছে।' বলে পকেট থেকে ফোন বের করলেন তিনি। নম্বর ডায়াল করে বললেন, 'উপরে এসো শিহান।'

মিনিট তিনেকের মাঝেই পালিত হলো সেই আদেশ। রাফসানের বাসায় প্রবেশ করল পঁচিশ বছর বয়সী এক যুবক। ওর সমান না হলেও, লম্বায় কম যায় না। পাঁচ ফুট আট-নয় তো হবেই। পেটা শরীর। চেহারায় ছেলেমানুষিভাব। স্যালুট ঠুকল যুবক।

'শিহান, এ হচ্ছে রাফসান। সি.ডি.আর.সি.-র কেসটায় আমাদের কনসালটেন্ট।'

হাত বাড়িয়ে দিল যুবক। 'আমি আশিকুর রহমান, স্যার। ডাক নাম শিহান।'

করমর্দন করল রাফসান। 'চলো তাহলে, কাজে নামা যাক।'

I

চোখের উপর সূর্যের আলো এসে পড়ছে, অথচ নড়ার মতো শক্তি অবশিষ্ট নেই ওয়াজেথের দেহে।

ক্যাপ্টেন রুস্তম আর নাবিক দারিয়ুসের সাথে লড়াই করার কয়েকদিন পরের ঘটনা। পায়ে পাওয়া আঘাতটা বেশ টাটাচ্ছে। প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে যা যা করা দরকার, করেছে ও। প্রথমেই একটা পাত্রে প্রস্রাব করে নিয়ে সেটাকে ঢেলে দিয়েছে ক্ষতের উপর। ক্ষতে পচন ধরা আটকাতে এই পদ্ধতি মিশরে অহরহ ব্যবহার করা হতো।

এরপর পরিষ্কার কাপড় ধুয়ে নিয়ে, সেটা দিয়ে ক্ষতের জায়গাটা বেঁধে রেখেছিল ও। কিন্তু কাজে যে দেয়নি এসব পদ্ধতি, তা এখন পরিষ্কার।

পরেরদিনই গা কাঁপিয়ে জ্বর এসেছে। আসব আসব করছিল রাত থেকেই। ভাগ্য ভালো, জাহাজের মুখ যেন পরিবর্তন না হয় সেজন্য আগেই হালটাকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছিল ও। একটা পরিষ্কার কোণ বেছে নিয়ে মজুদ করেছিল পানি, খাবার আর বাড়তি কম্বল। পরের দিন বিকাল থেকেই আচ্ছন্ন অবস্থায় কাটছে ওয়াজেথের দিন। এই জ্ঞান পাচ্ছে, আবার হারাচ্ছে। নড়তে চড়তে পারছে না একদম। এই কদিন চোখে আলো পড়েছে কিনা, জানে না ও। অবশ্য কয়েকদিন পার হয়েছে, নাকি একদিন, তা-ও নিশ্চিত করে বলতে পারবে না।

বাবা-মা আর ভাই বোনদের কথা খুব মনে পড়ছে ওর।

বাবা রাশভারী ছিলেন খুব, কথা বলতেন কম। পেশায় ছিলেন মূর্তি নির্মাণকারী। নেশায় কবি। অমিশুক ছিলেন বলে পের–ওয়াজেঠথ শহরটা খুব কাছাকাছি হলেও, হাতে গোণা কয়েকবার পা রেখেছিলেন ওখানে। তা-ও কাজের প্রস্তাব পেয়েছিলেন বলে।

খুব নাম ছিল বাবার নির্মিত মূর্তির। তার হাতের ছোঁয়ায় ওগুলো যেন প্রাণ পেত। বাড়ির এক পাশেই ছিল বাবার কাজ করার জায়গা। সেখানে বেশ কয়েক রাত 'পথ ভুলে' উপস্থিত হয়েছিল কিশোর ওয়াজেথ। মনে আছে, বীভৎস লাগত তখনকার অর্ধ-বানানো মূর্তিগুলো। মনে হতো যেন প্রবল আক্রোশে কেউ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মিশরের দেবতারাই ছিলেন এমন। পান থেকে চুন খসলেও নেমে আসত তাদের অভিশাপ।

বাবা এতটাই নামকরা ছিলেন যে যখন পের-ওয়াজেঠথের পাশে উল্কাপাত হলো, তখন তাকে পাঠানো হলো সেই উল্কার অংশ নিয়ে আসতে। হুকুম দেয়া হলো, ওয়াজেঠথ দেবীর এক মূর্তি বানাতে হবে ওই পাথর থেকে।

অদ্ভুত ছিল সেই পাথরটা। অবশ্য মহাকাশ থেকে যা এসেছে যা, তা অদ্ভুত হবারই কথা। কালো মিশমিশে দেহ ছিল ওটার; যেখানে পড়েছিল তার আশেপাশের অনেকটা অংশ জুড়ে, এমনকী দিনের তপ্ত সূর্যের নিচেও শীতলতা অনুভব করা যেত। যে কাউকে আনতে পাঠালেই হতো হয়তো, কিন্তু সমস্যাও ছিল। শীতলতা আর ছায়া পেয়ে ওই পাথরের চারপাশ ছেয়ে গিয়েছিল সাপে! অগণিত সাপ যেন আঁকড়ে ধরেছিল পাথর খণ্ডটাকে।

বাবা কীভাবে কাজটা পেরেছিলেন, তা আজও বুঝে পায় না ওয়াজেথ। অবশ্য, দেবী ওয়াজেঠথ-এর মূর্তি বানাবার জন্য যেহেতু কাজে লাগান হবে উল্কাপিণ্ডটাকে, তাই হয়তো দেবী নিজ হাতে বাবাকে রক্ষা করেছিলেন। হাজার হলেও, সাপের দেবী তো তিনি নিজেই।

অনেকটা পাথর নিয়ে এসেছিলেন বাবা। একবারে বইতে পারেননি বলে কয়েক বারে বয়ে আনতে হয়েছিল। কালো পাথর কুঁদে অসাধারণ এক মূর্তি বানিয়েছিলেন দেবীর। ওটার দেহ ছিল সাপের, মাথা এক মহিলার। কাছ থেকে দেখলে হয়তো ওটাকে প্রাণহীন মনে হলেও হতে পারে। কিন্তু দূর থেকে দেখলে বোঝার একদম যো নেই!

বেঁচে গিয়েছিল পাথরের অনেকটুকু। সেগুলো কাজে লাগিয়ে নিজেদের জন্য ছোট আকারের এক ওয়াজেঠথকে বানিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। আধ-হাতের সমান লম্বা মূর্তিটা অবশ্য ছিল অন্যরকম দেখতে, মানুষের মতো। মনে হতো যেন ধ্যানে বসে আছেন কেউ!

আরও একটা কাজ করেছিলেন বাবা। ওদের ভাই-বোন সবার জন্য ছোট ছোট কয়েকটা লকেট বানিয়েছিলেন। কালো লকেটগুলো ছিল একদম পাতলা, ওর একদম ছোট দুই ভাইবোনের জন্যও বানিয়েছিলেন। কিন্তু ওরা একটু বেশিই ছোট ছিল বলে মা পরতে দেননি, যদি মুখে দিয়ে ফেলে তো? গলায় আটকে গেলে আর দেখতে হবে না! তাই ওগুলো ওয়াজেথের কাছেই থাকত। জিনিসগুলো খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল ওর। নিজেরটা সবসময় গলায় ঝুলিয়ে রাখত। আর অন্যগুলো শোবার সময় বালিশের নিচে না রাখলে যেন ঘুমই হতো না। বড় খণ্ডটার মতো এই ছোট মূর্তিটার চারপাশেও বিরাজ করত অদ্ভুত এক শীতলতা। ঘুমটা ভালো হতো

বলে ওটার পায়ের কাছেই শুত ভাই-বোনেরা। সাপের ভয় পায় না কেউ। পাবেই বা কেন? ওয়াজেঠথ দেবী কি তার পায়ের কাছে শুয়ে থাকা কাউকে সাপে কাটার অনুমতি দেবেন? অসম্ভব!

আজও পকেটে ছোট দুই ভাই-বোনের লকেট নিয়ে ঘুরছে ওয়াজেথ। যদি কোথাও...কোনভাবে...কোন কারণে দেখা হয়ে যায়?

যেদিন বেদুঈনরা ওদের গ্রামে আক্রমণ চালিয়েছিল, সেদিন...নাহ, ভুল হলো। সেই রাতের দৃশ্যগুলো যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ও। আচমকা চিৎকার আর কান্নার আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল ওয়াজেথের। বয়স তখন একদম কম, তাই ভয় পেয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল বেচারা। উপায়ান্তর না দেখে, ওয়াজেঠথের মূর্তিটা কোলে নিয়ে বসে প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছিল ও।

বিফলে গিয়েছিল সেদিনের সব আকুতি।

আচমকা একটা চিৎকার শুনতে পেয়েছিল ওয়াজেথ-মায়ের চিৎকার। বেচারা জানে না, চোখের সামনে স্বামীকে তলোয়ার বুকে নিয়ে আছড়ে পড়তে দেখে গলা থেকে বেরিয়ে এসেছিল ওই জান্তব আওয়াজটা। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, স্বামীর ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে মহিলাও।

এরপর দস্যুরা এসে ঢোকে ওদের ঘরে। ভাই-বোনদেরকে ধরে বেঁধে নিয়ে যায়। এই বয়সী ছেলে-মেয়েদের দাস হিসাবে বাজারে খুব চাহিদা। নিজের মতো করে গড়ে নেয়া যায়। গৃহপালিত পশুর মতোই নিরীহ হয় এরা।

সেই শেষ দেখা, এরপর আর পরিচিত কোন মুখ দেখার সৌভাগ্য হয়নি ওয়াজেথের। তবে কপাল ভালো, লকেট আর মূর্তিটা হাতছাড়া করতে হয়নি। দেবীর রুষ্ট হবার ফল জানা ছিল এই দস্যুদেরও! জানে, উপাসকের কাছ থেকে উপাস্যকে আলাদা করার পরিণতি হবে ভয়াবহ। কী দরকার রে বাবা?

জ্বরে আচ্ছন্ন ওয়াজেথ শুয়ে শুয়ে ভাবছে এসব। এদিকে বাতাস পেয়ে সোজা ছুটছে ক্যাপ্টেনহীন...নাবিকহীন জাহাজ।

ওয়াজেথের জানা নেই, অচিরেই একদল সওদাগর দেখা পাবে ওর জাহাজটার। অদ্ভুত দর্শন এই সওদাগরেরা। এরা ধুতি পরে চলাফেরা করে, গায়ে থাকে কুর্তা। মাথায় তিলক থাকলেও থাকতে পারে, না-ও পারে। অদ্ভুত এক ভাষায় কথা বলে এরা। ব্যবসার জন্য চলে যায় দূর-দূরান্তে। ওয়াজেথের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে

তারাই। এমন সেই চিকিৎসা পদ্ধতি, যার নাম কেবল ও কেন, ওর দুনিয়ার কেউ শোনেনি-আয়ুর্বেদ!

আর ওকে নিয়ে যাওয়া হবে অসম্ভব সুন্দর এক জায়গায়।

হাজার বছর পর যেই জায়গাটার নাম হবে 'গোয়া'!

॥

শেষ যে স্মৃতি মনে পড়ে ওয়াজেথের, তা হলো প্রচণ্ড জ্বরে আছন্ন হয়ে পড়া।

জাহাজের এক কোনায় একটা আবাস বানিয়ে নিয়েছিল ও। হাতের কাছে রেখেছিল সব রসদ, চোখ খুললেই দেখতে পাচ্ছিল কাঠের ছাদ। এখন দৃশ্য পুরো পালটে গিয়েছে। মাথার উপরের কাঠ প্রতিস্থাপিত হয়েছে পাতার ছাউনিতে!

ছেলেটার জানা নেই, গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে যমে মানুষে টানাটানি হয়েছে ওকে নিয়ে। কয়েকবার যম প্রায় জিতেই যাচ্ছিলেন, অনেক কষ্টে বৈদ্য গৌতম টেনে ফিরিয়েছে ওকে। প্রচণ্ড জ্বরে গা যেন পুড়ে যাচ্ছিল, সেই সাথে আরেকটু হলেই পচন ধরত ক্ষতে।

চোখ খুলেই প্রথমে পাতার ছাউনি নজরে পড়ল ওয়াজেথের, এরপর দেখতে পেল বৈদ্যকে। এমন কমবয়সী চিকিৎসক সহজে দেখা মেলে না। আটাশ কি উনত্রিশ হবে লোকটার বয়স। মাথাটা প্রায় কামানো, শুধু পেছন দিকে একটা টিকির মতো আছে। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত হলেও, কোমরে ধুতি জড়ানো। ওয়াজেথ অবশ্য এই ধুতির সাথে খুব একটা পরিচিত নয়।

খুক খুক করে কেশে, গৌতমের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস পেল ও।

কাজে দিল ফন্দি, অনেকটা চমকে উঠেই রোগীর দিকে ফিরে তাকাল বৈদ্য। ওকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আরেকটু হলেই যেন লাফ দিত। আসলে কম বয়সে পিতার কাছে শিক্ষা নেয়া শুরু করেছে বলে, অল্পদিনেই বৈদ্য হয়ে গিয়েছে গৌতম। কিন্তু আদপে তো বয়স কম। তাই অনুভূতির প্রকাশও চড়া সুরে বাঁধা।

নিজেকে সে সামলেও নিল খুব দ্রুত। এগিয়ে এসে কুসুম গরম পানি ছোঁয়াল ওয়াজেথের ঠোঁটে। বিড়বিড় করে বলল, 'তোমার আহেনতো জ্বরা হয়েছিল। এখন এটা খাও। ভালো লাগবে।'

বিজাতীয় ভাষার একটা বর্ণও বুঝতে পারল না ওয়াজেথ। কিন্তু গৌতমের কথার নম্রভাব আর চেহারার নরম প্রকাশ বুঝতে পারল পরিষ্কার। দ্বিরুক্ত না করে পান করে নিল ও। তবে সাথে সাথে বিকৃত হয়ে এল চোখ-মুখ। রোগীর চেহারা দেখে হেসে ফেলল বৈদ্য, সুদর্শন চূর্ণ খেয়ে কারও মুখেই হাসি ফোটে না।

জ্বরে ভুগে দুর্বল হয়ে গিয়েছে ওয়াজেথের দেহ। এই অল্প কিছুক্ষণের পরিশ্রমেই প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেল যেন ও। দেহটাকে আর ধরে রাখতে না পেরে এলিয়ে দিল বিছানায়।